মাসুদ রানা

পিশাচ দ্বীপ

কাজী আনোয়ার হোসেন



রানা-৩২

পিশাচ কাহিনী

পিশাচ দ্বীপ



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শো রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১

পিশাচ দ্বীপ

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৭৩

এক

সুখ-স্বপ্ন দেখছিল রানা।

সোহানাকে রাজি করিয়ে এনেছিল প্রায়, এমনি সময়ে ঘুম ভেঙে গেল মাথার কাছে সাইড টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনের কর্কশ শব্দে। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল সে। চোখ মেলল ধীরে ধীরে।

প্রথমে দেখল হাতঘড়িটা। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা ঘড়ি পরে থাকে সে। স্নান করবার সময় খোলে শুধু। সাড়ে ছ'টা বাজে। সূর্যটা উঠি উঠি করছে। চারদিক ফর্সা। রোজকার মত সজনে গাছের ডালে কিচিরমিচির করছে অনেকগুলো শালিক। পাঁচিলের ওপর বসে বিচিত্র সুরে শিস দিচ্ছে একটা দোয়েল। খোলা জানালা দিয়ে শিউলি ফুলের গন্ধ আসছে।

কে ফোন করল? সোহানা? সালমা? নাকি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে কেউ? রানা ইনভেস্টিগেশনের কোন ক্লায়েন্টের পক্ষে ওর বাসার টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কাজেই পরিচিত কেউ। কে?

হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা নিয়ে এল রানা কানের পাশে, হাই তুলতে তুলতে বলল, 'হ্যালো?'

'কুত্তার মত ডাক ছাড়ছিস কেন, শালা? এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠলি?'

ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর পরিচিত কণ্ঠস্বর। সোহেল। বহুদিন পর ওর সাড়া পেয়ে খুশি হয়ে উঠল রানা। হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। বলল, 'ধুশ্‌শালা! দিলি ঘুমটা ভাঙিয়ে। দারুণ এক স্বপ্ন দেখছিলাম···'

'তোর পাশে কে শুয়ে রে?'

'তুই বল দেখি?'

'বলতে পারলে কি দিবি?'

'লাথি দেব। না পারলেও। কিন্তু পারবি না তুই।'

'পারব। সোহানা।'

'হলো না। কি রকম লাথি তোর পছন্দ? খালি পায়ের, না···'

'বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই সোহানা রয়েছে তোর পাশে। নেই? বল্, খোদার কসম?'

'খোদার কসম।'

একটু যেন থমকে গেল সোহেল, তারপর বলল, 'সোহানা নেই তো কে আছে?'

'কোল বালিশ।'

'ব্যাপারটা কিন্তু সিরিয়াস,' একটু গম্ভীর হলো কণ্ঠস্বর। 'সত্যিই সোহানা নেই তোর কাছে?'

'নেই। সত্যি। মাসখানেক দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। কিন্তু সোহানার ব্যাপারে এই সাত সকালে তোর এত ইন্টারেস্ট কেন বল দেখি? ওকে নিয়েই তো স্বপ্ন দেখছিলাম, রাজি করিয়ে ফেলেছিলাম প্রায়, দিলি তুই ব্যাটা সব ভণ্ডুল করে।'

'ভালই করেছি দেখা যাচ্ছে!' হাসল সোহেল হো হো করে। 'আর একটু দেরি করলেই হয়তো সর্বনাশ হয়ে যেত মেয়েটার! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা!'

'হাসিস না। ধমক দিল রানা। কি হয়েছে বলে ফেল, শালা। কি সিরিয়াস ব্যাপার…'

'ঘুম থেকে তুলেই শক দেয়া ঠিক হবে কিনা ভাবছি।' আবার গম্ভীর হলো সোহেল।

'শক অ্যাবজরবার লাগিয়ে নিলাম, নে বল।'

'সোহানাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

এবার রানার পালা। হো হো করে হেসে উঠল। 'ইয়ার্কি মারার জন্যে ফোন করেছিস? হাতে কাজ নেই বুঝি?'

'ইয়ার্কি না, দোস্ত। সিরিয়াস।'

'বেশ তো, কাগজে নিখোঁজ সংবাদ দিয়ে দে একটা। কচি খুকি, হারিয়ে গেছে স্কুল থেকে ফেরার পথে, কেহ যদি এই বালিকার সংবাদ পান…'

'কচি খুকি হলে চিন্তা ছিল না, নয় বলেই তো চিন্তা। গত তিন দিন থেকে কোন পাত্তা নেই ওর।'

সামান্য কুঁচকে গেল রানার ভ্রু-জোড়া। তিনদিন ধরে গায়েব! ভাবনার কথা।

'আত্মীয়-স্বজন বা কোন বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে গেছে হয়তো…'

রানার কথার মধ্যেই বাধা দিল সোহেল। 'সব জায়গায় খোঁজ নেয়া হয়েছে। কোথাও যায়নি। বাড়িতেও কিছু বলে যায়নি কাউকে। তোদের ঝগড়ার কথা জানি বলে তোকে হিসেবের বাইরে রেখেছিলাম এই ক'দিন। একটা ক্ষীণ আশা তবু ছিল হয়তো তোর কাছে কোন খবর পাওয়া যাবে, হয়তো গোপনে মিটমাট করে নিয়েছিস তোরা, কিন্তু সেটা যখন হয়নি, তখন…' বলতে বলতে থেমে গেল সোহেল, অন্য সুরে শুরু করল, 'বুড়োকে এখন ঠাণ্ডা করি কি করে বল দেখি? সাংঘাতিক অস্থির হয়ে পড়েছে বুড়ো, যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই ধমক মারছে, মাথাটা গরম হয়ে উঠছে ক্রমেই, আজকের মধ্যে কোন খবর বের করতে না পারলে ধমকের ঠেলায় সবাই পালাবে অফিস থেকে। তুই একবার আসবি আজ এদিকে?'

'না বাবা, তোমরা নিজেরাই ধমক খাও, আমার দরকার নেই। আমার অন্য কাজ আছে।'

'প্লীজ, রানা, একটু ঠাণ্ডা করে দিয়ে যা বুড়োকে। আমরা সামলাতে পারছি না।'

'বলে দে, ভেগেছে কোন ছোঁড়ার সাথে।'

'বলেছি। কিন্তু বুড়ো বলে ভাগলে তোর সাথে ভাগতে পারত, কিন্তু যেহেতু তোর মত ভাল ছেলে হয় না এবং এ ধরনের জঘন্য কাজ তোর দ্বারা সম্ভব না, সেইহেতু ভয়ানক কোন বিপদে পড়েছে সোহানা। তুই আসছিস কিনা বল্।'

'আসছি। শুধু বুড়োই নয়, তুইও বেশ খানিকটা ঘাবড়েছিস মনে হচ্ছে?'

'ঠিকই ধরেছিস। কিছু তথ্য পাওয়া গেছে ঘাবড়াবার মতই। অফিসে এলেই জানতে পারবি। সাড়ে আটটার মধ্যে চলে আয়।'

'ঠিক আছে। আসছি।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আড়মোড়া ভাঙল রানা, প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে তুড়ি দিল, গোটা বিশেক ভি-সিটাপ দিয়ে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। খালি পেটে পানি খেলো একগ্লাস, তারপর বাথরুম সেরে এল দশ মিনিটে। ক্লীন শেভ্‌ড্। ঝাড়া বিশ মিনিট স্কিপিং করার পর হাল্কা ডন-বৈঠক দিল দশ মিনিট, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। সর্বাঙ্গে ঘাম, প্রশস্ত বুকটা ওঠানামা করছে দ্রুত।

রানাকে দেখে অনাবিল আনন্দ প্রকাশ করল গুণ্ডা। বেশ বড় হয়েছে এখন। লেজ নাড়ল, লাফিয়ে উঠে কোলাকুলি করবার চেষ্টা করল, রানাকে অন্যমনস্ক পেয়ে চেটে দিল গালটা, তারপর এক থাবড়া খেয়ে অভিমানে উথলে উঠল ওর বুক। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ব্লাড হাউণ্ডের বাচ্চা—বেড়াতে যাবে না রানার সঙ্গে। মান ভাঙাতে অবশ্য বেশিক্ষণ লাগল না রানার, খানিক আদরেই গলে গেল গুণ্ডা, মিনিট দুয়েক পর দেখা গেল দুই বন্ধু খেলা করছে সামনের লনে।

শরীরের ঘাম শুকিয়ে আসতেই গুণ্ডাকে রাঙার মার হাতে সোপর্দ করে দিয়ে বাথরুমে ফিরে এল রানা। শাওয়ারের নিচে ভিজল দশ মিনিট, সাবান মেখে দূর করল গ্লানি, গা মুছে, চুলগুলো ব্রাশ করে চলে এল বেডরুমে। দরজায় টোকা এবং সেই সঙ্গে রাঙার মার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'নাস্তা রেডি হয়ে গেছে, আব্বা। দেব?'

'দাও।'

ধীরে সুস্থে এক এক করে জামা কাপড় পরল রানা, সালমাকে কয়েকটা নির্দেশ দিল ফোনে, তারপর চলে এল ডাইনিং রুমে। একটা ইংরেজি আর একটা বাংলা দৈনিক সাজানো আছে নাস্তার কাপ-তস্তরী-প্লেটের পাশে। অন্যমনস্কভাবে হেডিংগুলোর ওপর চোখ বোলাল রানা নাস্তা খেতে খেতে। দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ পাতার বিজ্ঞাপনগুলো দেখল। গোটা চারেক বাটার টোস্ট, দুটো কলা, আর একপ্লেট স্ক্র্যাম্বলড্ এগ দিয়ে নাস্তা সারল। পট থেকে ঢেলে নিল এক কাপ কফি। সেই সঙ্গে ধরাল দিনের প্রথম সিগারেট।

কেন যেন সোহানার খবর শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেছে রানার। যতই হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা, ততই পরিষ্কার হয়ে উঠছে ওর কাছে যে এটা হাসির ব্যাপার নয়। গেল কোথায় মেয়েটা? কোন পুরুষ বন্ধু জুটিয়ে নিয়ে প্লেজার ট্রিপে যাবার মেয়ে নয় সোহানা। অনেক সাধ্য সাধনা করেও দু'এক কদমের বেশি এগোতে পারেনি রানা। শেষ বাধাটা ডিঙাতে পারেনি কোনদিন। সে হঠাৎ কারও সাথে ভাগবে—হতেই পারে না। তাছাড়া পালাতে যাবে কেন? গার্জেন নেই, বাবা মারা যাবার পর থেকে বাড়ির কর্ত্রী সে নিজেই, কারও তোয়াক্কা রেখে চলতে হয় না তাকে—কাজেই পালাবার প্রশ্ন ওঠে না। কোন দুষ্কৃতকারীর চোখে পড়ে যাওয়ায় ধরে নিয়ে গেছে ওকে, আর যার বেলায়ই হোক, সোহানার

বেলায় এ কথা খাটে না; বিসি আই-এর ট্রেনিং পাওয়া মেয়ে, ইচ্ছে করলে ও-ই বরং গোটা দশেক দুষ্কৃতকারী ধরে এনে বেঁধে রাখতে পারে। তাহলে··· গেল কোথায়?

ধমক খেয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে এল দুই বন্ধু বড় সাহেবের ঘর থেকে।

মেজর জেনারেলের সর্বশেষ কথা হচ্ছে, '···আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন, নিজেরা বোঝো না? তিন-তিনটা দিন পার হয়ে গেল, কেউ একটা খোঁজ পর্যন্ত বের করতে পারল না মেয়েটার! আপনি চিন্তা করবেন না স্যার, সব ঠিক হয়ে যাবে স্যার, আজই খবর পাওয়া যাবে, স্যার, এমন কথার কোন মানে হয়? সবাই মিলে আমাকে সান্ত্বনা দিলেই উদ্ধার হয়ে যাবে মেয়েটা?' স্বর পরিবর্তন করে বললেন, 'কিসের পাল্লায় পড়েছে মেয়েটা কে জানে!' তারপর বাঘের চোখে ফিরলেন রানার দিকে। 'আর তুমিই বা কিরকম ছেলে, রানা? সহকর্মী একজন গায়েব হয়ে গেল আজ তিনদিন, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ, অফিসের কার কি হলো খবর রাখাও প্রয়োজন বোধ করো না। এই সোহেলটা যেমন, তুমিও তেমনি। সব অপদার্থ। যাও এখন, যা পার করো গিয়ে, আমাকে জ্বালাতন কোরো না।'

চায়ের অর্ডার দিয়ে একগাল হাসল সোহেল। 'কেমন লাগল?'

'খুব ভাল লাগছে। কারণ আমি জানি, আমার দিকে চেয়ে আসলে তোকে বকেছে বুড়ো। অফিসের কোন ব্যাপারে খোঁজ রাখার কথা নয় আমার, বুড়ো জানে ভাল করেই, তাই আমার চোখে আঙুল দিয়ে তোকে দেখানো হলো তোর ইনএফিশিয়েনসি।'

'উঁহুঁ। আসলে তাও নয়। বুড়ো ভাল করেই জানে আমার সাধ্যমত সবকিছুই করছি আমি। তথ্য যা সংগ্রহ করেছি, সবই জানিয়েছি বুড়োকে। কিন্তু এসব তথ্য থেকে রহস্যের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি বুড়ো। তাই খেপে গিয়েছে নিজেরই ওপর। একে আদরের দুলালী, তার ওপর বন্ধুকন্যা, তার ওপর শুনেছি দূর সম্পর্কের কেমন যেন নাতনীও হয়। বুঝে দ্যাখ!'

'ওসব বোঝা আছে, শালা। গাল খেয়ে এখন যুক্তি বের করছিস। কি কি তথ্য জোগাড় করেছিস, ঝেড়ে ফেল, দেখি তোকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করা যায় কিনা।'

চা এল। রানার দিকে আনকোরা এক প্যাকেট বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস ছুঁড়ে দিল সোহেল। দুটো সিগারেট বের করে সোহেলের দিকে একটা এগিয়ে দিল রানা, নিজে ধরাল একটা, তারপর মৃদু হেসে প্যাকেটটা রেখে দিল নিজের পকেটে।

চায়ে চুমুক দিয়ে গড়গড় করে বলে গেল সোহেল মোটামুটি সবটা ব্যাপার। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে চুপচাপ শুনল রানা। সোহেল থেমে যাবার পরও একই ভঙ্গিতে বসে সিগারেট টানল মিনিট দুয়েক। তারপর চোখ মেলল।

রাহাত খানের ভঙ্গি নকল করে বলল সোহেল, 'তোমার কোন প্রশ্ন আছে, রানা?'

মুচকি হাসল রানা। 'বুঝলাম, গত সোমবার বিকেলে একজন লোক দেখা করতে গিয়েছিল সোহানার সঙ্গে ওর বাসায়; চা নাস্তা নিয়ে ড্রইংরূমে গিয়ে বেয়ারা দেখল লোকটাও নেই, সোহানাও নেই; ড্রাইভার বলেছে, ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে একজন লোকের সঙ্গে একটা ক্রাউন ডিলাক্সে উঠতে দেখেছে সে সোহানাকে: তারপর থেকে ওর আর কোন খবর নেই। এই তো গেল ঘটনা। এবার তোর অ্যাচিভমেন্ট শোনা যাক। কি কি জানতে পারলি খোঁজ খবর করে?'

'আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম, সন্ধ্যার ফ্লাইটে কক্সবাজার চলে গেছে ও আয়েশা শিকদার নাম নিয়ে।'

'ও-ই সোহানা সেটা জানা গেল কি করে? আইডেন্টিফাই করেছে কেউ?'

'এয়ার হোস্টেসের বর্ণনা থেকে আন্দাজ করে নিয়েছি আমরা। ডেফিনিট কিছু জানা যায়নি। চেহারার বর্ণনা মিলে যাচ্ছে সোহানা এবং সেই লোকটার সঙ্গে।'

'কক্সবাজারে সোহানার একটা বাড়ি আছে, সেখানে···'

'খোঁজ নিয়েছি। যায়নি সেখানে। কক্সবাজার পৌছেই মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়।'

'লোকটার চেহারা কি রকম?'

'তিনজনের বর্ণনা তিন রকম। শুধু তিনটে ব্যাপারে মিল আছে—লোকটার চোখ দুটো অসম্ভব লাল, বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে, আর হাতে একটা কালো ব্রিফকেস ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মাস তিনেক আগে পূরবীর সঙ্গেও এই চেহারার একজন লোককে দেখা গিয়েছিল।'

'পূরবী কে? ও, সেই নিখোঁজ ভারতীয় অভিনেত্রী? আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি ওর?'

'না। আরও কয়েকজন নিখোঁজ হয়েছে গত কয়েক বছরে। তাদের মধ্যে রয়েছে একজন নামজাদা গায়ক, একজন সিনেমার নায়ক, আর একজন সাবেক মিস্টার ঈস্ট পাকিস্তান—গুলজার বেগ। বছরখানেক আগে রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়েছিলেন একজন বোটানির পিএইচ ডি—ডক্টর আলম। এদের কারও কোন খবর পাওয়া যায়নি আর।' রানার দিকে একটা ফাইল ঠেলে দিল সোহেল। 'গত তিনদিনে আমরা এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি আলাদা ভাবে, পুলিশ এবং সিআইডি-র রিপোর্ট ঘেঁটে দেখেছি। সব পাবি এই ফাইলে। উল্টেপাল্টে দেখতে পারিস। তবে এসব দেখে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না আমার।'

'কোন্সব দেখলে লাভ হবে?'

'জানি না। সোহানা জড়িয়ে না পড়লে আমরা বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতাম না এই ব্যাপারে। কে কোথায় কেন নিখোঁজ হলো, আমাদের দেখার কথা না। কিন্তু দেখতে গিয়ে পুলিশ আর সিআইডি-র মত আমরাও থমকে গেছি একটা জায়গা পর্যন্ত এসে—আর এগোবার কোন রাস্তা পাচ্ছি না। তুই কিভাবে কি করবি ভাবছিস?'

উত্তর না দিয়ে ফাইলটা টেনে নিল রানা। দশ মিনিট কেটে গেল চুপচাপ। একটার পর একটা পাতা উল্টে যাচ্ছে রানা, রানার চেহারার কোন পরিবর্তন হয় কিনা লক্ষ করছে সোহেল। এক জায়গায় এসে ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে গেল

রানার। চট করে প্রশ্ন করল সোহেল, 'কি হলো?' মৃদু হেসে আবার ফাইলে মন দিল রানা। সব ক'টা পাতা দেখা হয়ে গেলে বন্ধ করে ঠেলে দিল ওটা সোহেলের দিকে।

'তোর স্টেনোকে ডাক।' একটা সিগারেট ধরাল রানা বেনসন অ্যাণ্ড হেজেসের প্যাকেট থেকে, আরেকটা বের করে ছুঁড়ে দিল সোহেলের দিকে।

খপ করে সেটা শূন্যে ধরে ফেলল সোহেল, বেল টিপে দিয়ে ঝুঁকে এল সামনের দিকে। 'কি ব্যাপার, দোস্ত, কিছু বুঝতে পারলি?' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'স্টেনোকে ডাকতে বললি কেন? নিশ্চয়ই কোন প্ল্যান এসেছে তোর মাথায়?'

'স্টেনোকে ডাকতে বললাম একটা চাকরির দরখাস্ত লেখার জন্যে। হঠাৎ চাকরির দরকার হয়ে পড়েছে আমার। এ চাকরি আর করা যাবে না।'

পাঁচ সেকেণ্ড থম ধরে রানার দিকে চেয়ে রইল সোহেল। 'একটু ভেঙে বল, দোস্ত। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি।' সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাইল রানার দিকে।

দরজায় টোকা পড়তেই একটা বোতাম টিপল সোহেল। খুলে গেল দরজাটা। খাতা পেন্সিল আর একগাদা পারফিউমের গন্ধ নিয়ে ঘরে ঢুকল সোহেলের স্টেনো। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে যে কোন একটা বছর বয়স হবে মহিলার, সাজ-গোজের বাহারে অনুমান করা কষ্টকর। দীর্ঘাঙ্গী, দেখতে ভাল। চেহারা ও চলনে বুদ্ধিমতী বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্য তা না হলে সোহেলের স্টেনো হবার সৌভাগ্য হত না।

মেয়েটিকে একনজর দেখে নিয়ে সোহেলের দিকে ফিরল রানা।

'তুই-ই ডিকটেশন দে। আমি কনটেন্টস্ বলে দিয়ে বিদায় নিই। শোন, জি. পি. ও. বক্স ৮৫০-এ বায়োলজির পিএইচডি ডক্টর মাসুদ রানা চাকরির দরখাস্ত করছেন। সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ নর্থ স্ট্যাফোর্ডশায়ার, বর্তমানে যেটাকে কীল ইউনিভার্সিটি বলা হয়, সেখান থেকে রিসার্চ ফেলে দেশের টানে এসেছিলেন দেশ গড়তে। এদেশে চাকরি, বেতন, সম্মান এবং অন্যান্য সব অবস্থা দেখে আবার চলে যাচ্ছেন বিদেশে, হার্ভার্ড এবং কীল থেকে আমন্ত্রণও পৌঁছে গেছে—হঠাৎ আজকের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে ইন্টারেস্টেড হয়েছেন। কাজটা পছন্দ হলে, রিসার্চের সুযোগ থাকলে, এবং বেতনের পরিমাণ যথেষ্ট হলে দয়া করে থেকে যেতে পারেন। সাক্ষাতে সমস্ত কাগজপত্র দেখানো হবে।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে উত্তরোত্তর বিস্ফারিত হচ্ছিল সোহেলের চোখ। এবার একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল। পনেরো সেকেণ্ড রানার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ছোঁ মেরে ফাইলটা তুলে নিল টেবিলের ওপর থেকে, দ্রুত হাতে পাতা উল্টাল, একটা পাতার ওপর দৃষ্টি থমকে রইল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর আবার চাইল রানার মুখের দিকে। মাথা নাড়ল। মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে ওর ঠোঁটে।

'তোর তুলনা হয় না, দোস্ত! সত্যিই গুণী লোক তুই! বিজ্ঞাপনটা আমিও

দেখেছি আজ সকালে, কিন্তু আমার মাথায় খেলেনি যে এই পোস্ট বক্সেই দরখাস্ত দিয়েছিল গুলজার বেগ আড়াই বছর আগে। গুড! এতক্ষণে মনে হচ্ছে কিছু একটা লাইন দেখা যাচ্ছে।' উঠে দাঁড়াল সোহেল তড়াক করে। 'সু-সংবাদটা বুড়োকে আগে জানিয়ে আসি চল্। এবার দেখবি কেমন খাতির করে···'

'না, দোস্ত, আমি উঠছি এখনি। যা জানাবার তুই-ই জানাস সময় মত. দরখাস্তটা আগে পাঠিয়ে দে। আজই যেন যায়। ওটা এমন ভাব নিয়ে লিখবি যেন ডক্টর মাসুদ রানা দয়া করে কৌতূহল প্রকাশ করছেন। বুঝেছিস তো?'

'বুঝেছি। কিন্তু বায়োলজির তো দুটো ভাগ রয়েছে, বোটানি আর জুলজি—কোনটা সম্পর্কে লিখব?'

'ওসব বুঝি না। যা ভাল বুঝিস করবি। তবে আপাতত বায়োলজি লিখে দিতে পারিস, তারপর বইপত্র ঘেঁটে যা ভাল হয় করা যাবে। আমাকে গোটা কয়েক বই পাঠিয়ে দিস, ইন্টারভিউ দেয়ার আগে একটু দেখেশুনে না নিলে দুই মিনিট কথা বলেই কান ধরে বের করে দেবে। অন্তত ঘণ্টাখানেক ঠেকাবার মত মেটেরিয়াল পাঠাবি আজই।' উঠে পড়ল রানা। 'ভাল কথা, সার্টিফিকেটগুলো তৈরি করে ফেল্ যত তাড়াতাড়ি পারিস। আর, বুঝতেই পারছিস, এটা অনেকটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত, জাস্ট অনুমান-এর ওপর ভিত্তি করে বাড়তি আশ্বাস দিস্ না বুড়োকে। টেল্ হিম ওনলি দা ফ্যাক্টস—অলরাইট? চলি। তোর চিচিংটা একটু ফাঁক করে দে।'

বোতাম টিপে দরজা খুলে দিল সোহেল। ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল রানা।

সোহেল ফিরল স্টেনোর দিকে।

'লেখো, দিস হ্যাজ রেফারেন্স টু ইয়োর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডেটেড···'

দুই

পরদিনই উত্তর এল।

মাথায় বাজ পড়ল রানার। আজই সন্ধে সাতটায় ইন্টারভিউ!

বাসায় ছিল না রানা। একজন লোক এসে পৌঁছে দিয়ে গেছে চিঠিটা। চেহারার বর্ণনা চাওয়ায় রাঙার মা বলল, 'কালো ব্যাগ হাতে আইসেছিল ভদ্দরনোক। চোখ দুটো নাঙা টুকটুকে। দেখলি মুনি হয় মাতাল।'

ইংরেজিতে লেখা ছোট্ট চিঠি। হাতের লেখাটা দলিল-লেখকদের মত, চোখের সামনে হয়তো লিখে যাচ্ছে কিন্তু দেখলে মনে হবে অন্তত সোয়াশো বছর আগের লেখা, প্রাচীন। সংক্ষিপ্ত চিঠি। আজ সন্ধ্যা সাতটায় দেখা করতে হবে ডক্টর শিকদারের সঙ্গে ইন্টারকনে।

সর্বনাশ!

ইতিমধ্যে সোহেল জানিয়েছে, গত কয়েক বছরের কাগজ ঘেঁটে দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি লোকের নিখোঁজ হবার সময় কোন না কোন বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে

কাগজে। জি. পি. ও. বক্স ৮৫০। ওই পোস্ট বক্সের মালিককে খুঁজে পাওয়া যায়নি। যে ঠিকানা দেয়া হয়েছে সেখানে কেউ থাকে না—পোড়োবাড়ি।

সোহেলের পাঠানো বইগুলো গত রাতে খানিক উল্টে-পাল্টে দেখেছিল রানা। দাঁত ফোটানো মুশকিল। পৃষ্ঠা দুয়েক পড়ার পরই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে সে টের পায়নি। ইন্টারভিউয়ের চিঠিটা দেখা মাত্র হার্টবিট উঠে গেছে একশো পঞ্চাশে। সারা বিকেল জনাতিনেক জাঁদরেল বায়োলজিস্টের লেখা বইয়ের সঙ্গে মল্লযুদ্ধের পর আল্লা ভরসা বলে উঠে পড়ল রানা, সোহেলের পাঠানো নকল সার্টিফিকেটগুলোর ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল, ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের উদ্দেশে।

হোটেলের সামনে গোটাকয়েক চেনা মুখ দেখে বুঝল রানা, অতি সাবধানী সোহেল চায় না, ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে সোহানার মত গায়েব হয়ে যাক সে-ও। তাহলে আমও যাবে ছালাও যাবে। সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করেছে সে।

লিফটে করে পাঁচতলায় উঠে এল রানা। সোজা গিয়ে ডক্টর শিকদারের দরজায় টোকা দিল।

'কাম ইন, প্লীজ।'

ভারি পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল দরজার ওপাশ থেকে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল রানা। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ এল নাকে। খুবই হাল্কা, কিন্তু বদ।

লিভিং রুমে সোফায় বসে কাগজ দেখছে একজন বয়স্ক লোক। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে। চোখে গাঢ় খয়েরি রঙের সানগ্লাস। টেবিলের ওপর কিসের যেন নকশা আঁকা আছে। গোল। অদ্ভুত সব চিহ্ন আঁকা তার ভিতর। রানার দিকে এক নজর চেয়েই কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল। নকশাটা ঢাকা পড়ল কাগজের নিচে। রানা লক্ষ করল, বেশ মোটাসোটা, অথচ লোকটার গালে কপালে অসংখ্য ভাঁজ। হাতের দিকে নজর পড়তেই বুঝতে পারল, শুধু গালে কপালে নয়, সারা শরীরই লোকটার জরজর। ফুলে আছে নীল রগ। পোশাক পরিচ্ছদ দামী, কিন্তু একটু যেন সেকেলে। গায়ের রঙ ফ্যাকাসে। লম্বা হবে পাঁচ ফুট সাত। দাঁতগুলো বাঁধানো মনে হচ্ছে। হাসছে রানার দিকে চেয়ে।

'আপনিই ডক্টর মাসুদ রানা? সো ইয়াঙ! আপনাকে আরও অনেক বয়স্ক মনে করেছিলাম আমি। আসুন, বসুন। শিকদার। রিয়েলি গ্ল্যাড টু মিট ইউ!' হাত বাড়িয়ে দিল।

বিনীত হাসি হেসে হ্যাণ্ডশেক করল রানা। লোকটার হাত স্পর্শ করেই চমকে উঠল ভিতরে ভিতরে। অসম্ভব ঠাণ্ডা হাত। শিরশির করে গায়ে কাঁটা দিল রানার, অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিউরে উঠল একবার। চট করে ছেড়ে দিল হাতটা। লোকটার নিঃশ্বাসে কেমন একটা দুর্গন্ধ আছে। নাকটা কুঁচকে উঠতে যাচ্ছিল, সামলে নিল রানা। বসল মুখোমুখি চেয়ারে।

'কি আনাব?' প্রশ্ন করল ডক্টর শিকদার। 'চা, কফি, ফান্টা, বিয়ার, না হুইস্কি?'

'ধন্যবাদ। কিছুই খাব না এখন। একটু আগেই দু'কাপ চা খেয়েছি।'

প্রথম দর্শনেই লোকটাকে ভয়ানক অপছন্দ হলো রানার। এর চারপাশে কেমন যেন একটা অশুভ, অমঙ্গলের পরিবেশ। লোকটার ভদ্রতা যেন ঠিক ভদ্রতা নয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মেকি। বাইরে থেকে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক মনে হলেও ভেতরে কোথাও যেন মস্ত ভজঘট আছে লোকটার মধ্যে। বাঁ হাতের অনামিকায় একটা তামার রিং, অদ্ভুত একটা পাথর বসানো আছে রিংয়ে, দেখতে মানুষের চোখের মত। কটমট করে চেয়ে রয়েছে চোখটা রানার দিকে। সর্বক্ষণ।

'কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন আপনি?' চশমাটা খুলে নামিয়ে রাখল শিকদার। সরাসরি চাইল রানার চোখে। 'কীল থেকেই?'

টকটকে লাল চোখের দিকে একবার চেয়েই চোখ সরিয়ে নিল রানা। বলল, 'হ্যাঁ। প্রথমে অবশ্য তিন বছর সাসেক্সে পড়েছি। পিএইচডি করেছি কীলে, প্রফেসার অ্যালান আর, গেমেল, জে, পি, বি, এসসি, এম, এস, পি, এইচ, ডি, এফ, আর, এস, ই, এফ, এল, এস-এর অধীনে। খুবই প্রিয় ছাত্র ছিলাম আমি ওঁর।' সার্টিফিকেটগুলো এগিয়ে দিল রানা। 'দেখুন না। সবই আছে এখানে।'

হাত বাড়িয়ে সার্টিফিকেট ঠাসা ফাইলটা নিল শিকদার, কিন্তু সেদিকে না চেয়ে বলল, 'কোন কোন সাবজেক্ট ছিল আপনার সাসেক্সে?'

'বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি, জেনেটিক্স, অ্যানিম্যাল ফিজিওলজি, প্ল্যান্ট ফিজিওলজি, ইকোলজি— সবই। বেসিক্যালি কেমিস্ট্রির ছাত্র আমি, কিন্তু থিসিস করেছি মাইক্রোবায়োলজিতে। ঠিক কি ধরনের রিসার্চ স্কলার দরকার আপনার?'

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রানার ফাইলে মনোনিবেশ করল ডক্টর শিকদার। মিনিট দশেক পর হঠাৎ ফাইলটা বন্ধ করে রানার দিকে ফিরল। মুখে একগাল হাসি।

'কবে নাগাদ যোগ দিতে পারবেন কাজে?'

বোঝা যাচ্ছে, পছন্দ হয়ে গেছে রানাকে। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল রানা।

'সেটা নির্ভর করবে কি ধরনের গবেষণা করতে হবে আমাকে তার ওপর। আমি চাইছি আমার লাইনেই রিসার্চ চালিয়ে যেতে। আপনার প্রয়োজন আমাকে দিয়ে পূরণ হবে কিনা সেটা আগে বোঝা দরকার। যদি...'

'হবে। নইলে আপনাকে নিয়োগ করবার প্রশ্নই উঠত না। আমি স্যাটিসফায়েড। দ্রুত কাজ শুরু করতে চাই। কবে আসছেন? টাকা পয়সার ব্যাপারে মোটেই ভাবতে হবে না আপনার।'

'ভাবনা-মুক্ত করুন।'

'মাসে ছ' হাজার। চলবে এতে?'

'চলবে।' হাসল রানা। 'কিন্তু আসছেন কথাটার মানে কি ঢাকার বাইরে কোথাও যেতে হবে আমাকে?'

হ্যাঁ। কাজটা রেসিডেনশিয়াল—আহার-বাসস্থান ফ্রী। কি ভাবছেন? রাজি?'

'কোথায় যেতে হবে, কি ধরনের গবেষণা করতে হবে, সেসব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করে না নিতে পারলে সম্মতি বা অসম্মতি জানাই কি করে?'

'আপনার কাজটা হবে আমাকে অ্যাসিস্ট করা। আপনার লাইনের বাইরে

কিছু করতে হবে না, এটুকু নিশ্চয়তা দেয়া যায়; কিন্তু ঠিক কি নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে, এবং কোথায় আমার গবেষণাগার, সে সম্পর্কে অন্তত আগামী একটা বছর আমি গোপনীয়তা রক্ষা করতে চাই।' রানাকে আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে দেখে চট করে যোগ করল, 'জায়গাটা বাংলাদেশের মধ্যেই। আপনি অপছন্দ করবেন না, সে ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দেয়া যায়; কিন্তু আগে থেকে এর বেশি আর কিছুই বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আপনার ছ' মাসের বেতন আমি এখুনি দিয়ে দেব, সেই সঙ্গে আরও চার হাজার দেয়া হবে আপনার দ্রুত-প্রস্তুতি এবং ভ্রমণ খরচা হিসেবে। মোট চল্লিশ হাজার টাকা। ক্যাশ।'

রানার চোখের দিকে জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে রয়েছে শিকদার। চট করে চোখ সরিয়ে নিল রানা। ভ্রু কুঁচকে ভাবনার ভান করল খানিকক্ষণ। তারপর আমতা আমতা করে বলল, 'বে-আইনী কিছু নয়তো?'

'আরে না, না। নট দ্যাট। আমার এই গোপনীয়তাকে ইডিয়োসিনক্র্যাসিও বলতে পারেন। খারাপ কিছু নয়। নিরিবিলিতে বসে কাজ করতে পছন্দ করি আমি, লোকজনের ভিড় থেকে একটু দূরে। কেউ গিয়ে যেন আমাদের কাজে বিঘ্ন না ঘটায়, তাই এই গোপনীয়তা। আপনি গেলে তো জানতেই পারছেন। আপনার সব রকমের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে সেখানে। বে-আইনী কাজে চোর ডাকাতের সাহায্য নেয় মানুষ, রিসার্চ স্কলারকে দরকার হয় না।'

যুক্তিটা যদিও মোটেই জোরাল হলো না, তবু আর টানা-হ্যাঁচড়া না করে এটাকেই অকাট্য যুক্তি হিসেবে মেনে নেয়ার ভাব দেখাল রানা। রাজি হয়ে গেল। কালো একটা ব্রিফকেস থেকে চারটে বাণ্ডিল বের করে রানার সামনে টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিল ডক্টর শিকদার। রানা লক্ষ করল ব্রিফকেসের ডালার ভিতরেও আঁকা রয়েছে সেই নক্‌শাটা। রানার সামনে একশো টাকার নোটের দশ হাজারী বাণ্ডিল। চারটে। এদিক ওদিক তাকাল রানা।

'দিন, কোথায় সই করতে হবে।' খবরের কাগজটা তুলে নিল রানা, ভাঁজ করে তার ওপর রেখে লিখবে।

'সই লাগবে না। আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট।' এবার ব্রিফকেস দিয়ে চাপা দিল শিকদার নক্‌শাটা।

'কোন ডকুমেন্ট রাখবেন না?' অবাক হলো রানা। 'আমি টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলে?'

বিশ্রী করে হাসল শিকদার। বলল, 'পালাতে পারবেন না।'

পালাতে গেলে রানার নীতিবোধে বাধবে, নাকি ওর হাত থেকে রানার পালাবার উপায় নেই, ঠিক কোন্‌টা বোঝাবার চেষ্টা করছে পরিষ্কার হলো না। এ নিয়ে কথা না বাড়িয়ে উঠবার উপক্রম করল রানা। বিনীত ভঙ্গিতে হাসল। টাকাগুলো পকেটে পুরল।

'আমি যে-কোনদিন যেতে পারি, ডক্টর শিকদার। আপনি প্রস্তুত হলেই আমাকে জানাবেন। আগামীকাল রওনা হতেও আমার কোন অসুবিধে নেই।'

'ঠিক আছে। কালই আসুন তাহলে। প্লেনে করে কক্সবাজার। ওখান থেকে

রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব আমি। আমি আজ রাতেই চলে যাচ্ছি, আমার লোক রিসিভ করবে আপনাকে এয়ারপোর্টে। অলরাইট?'

'অলরাইট।'

ঠাণ্ডা হাতটা আবার একবার শেক করে বাইরে বেরিয়ে এল রানা।

মনে হলো ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ওর।

তিন

'গার্ড রাখতে হবে, স্যার?'

লিফট থেকে বেরোতেই রানার কানের পাশে মোলায়েম কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল। বিসিআইয়ের লোক। যেন কারও অপেক্ষায় আছে এমনি একটা ঢিলিমিলি ভাব লোকটার মধ্যে। দাঁড়িয়ে আছে একটা থামে হেলান দিয়ে। কথা বলবার সময় ঠোঁট প্রায় নড়লই না। দৃষ্টিটা স্থির হয়ে আছে এক অল্প-বয়স্কা বিদেশিনীর সুডৌল নিতম্বে।

ওর দিকে না চেয়েই উত্তর দিল রানা, 'না। ওয়াচ রাখো। অলক্ষ্যে। কোথাও গেলে অনুসরণ করবে, বাধা দেবে না।'

'রাইট, স্যার।' উত্তর এল সংক্ষিপ্ত।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। দৃঢ় পায়ে এগোল কার পার্কের দিকে। একটা দুধ-সাদা মার্সিডিস টু হাণ্ড্রেড বিচ্ছিন্ন হলো গাড়ির ভিড় থেকে। ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে সেটা রানার দিকে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ভিতরের আরোহীকে। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থেমে দাঁড়াল গাড়িটা রানার পাশে। পেছনের দরজাটা খুলে গেল, সেই সঙ্গে ভেসে এল মেজর জেনারেল রাহাত খানের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'উঠে পড়ো, রানা।'

আশ্চর্য! সোহানার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন মেজর জেনারেল, জানে রানা; কিন্তু সে অস্থিরতার পরিমাণ যে এতখানি, কল্পনাও করতে পারেনি ও। মনে মনে ঈর্ষা বোধ করল রানা। অপেক্ষা করবার পর্যন্ত ধৈর্য নেই, সংবাদের জন্যে একেবারে এখান পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে! এতই আদরের! মাত্রাজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে বুড়ো!

বিনা বাক্য ব্যয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল রানা।

'তোমার গাড়িটা আমার বাসায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে সোহেল। ওখানেই যাচ্ছি আমরা এখন।'

সারাটা পথ একটা কথাও হলো না আর। ব্যাপারটা ছেলেমানুষী, ভাল করেই জানে রানা, তবু কেমন যেন অভিমান হচ্ছে ওর, চেষ্টা করেও দূর করতে পারছে না সেটা মন থেকে। রানার প্রতি ওঁর ভালবাসায় আর কেউ ভাগ বসাক, এটাই ওর পক্ষে সহ্য করা মুশকিল, এখন দেখা যাচ্ছে সবটাই দখল করে নিয়েছে আরেকজন।

আর সব জায়গায় রানা বাঘের বাচ্চা, তোয়াক্কা রাখে না কারও, কিন্তু এই জায়গাটায় এসেই এত দুর্বল হয়ে যায় কেন তা সে নিজেও বোঝে না। কেমন যেন অসহায় বোধ করে সে এই বৃদ্ধের স্নেহে ভাটা পড়তে পারে এমন সম্ভাবনা দেখা দিলে। অদ্ভুত এক আকর্ষণ আছে এই কট্টর বুড়োর। আসলে মহৎ একটা হৃদয় আছে মানুষটার, সাগরের মত গভীর, আকাশের মত উঁচু। বাইরেটা ভয়ানক কঠোর, হাসির ছিটে-ফোঁটা নেই মুখে, ধমক ছাড়া কথা নেই, সব সময় গরম—অথচ যার মন আছে সে সহজেই বুঝে নিতে পারে কী অপার স্নেহের ফল্গুধারা বইছে এই আদর্শবান, চিরকুমার বৃদ্ধের অন্তরের অন্তঃস্তলে।

'বসো, রানা, আমি আসছি এখুনি।'

রানাকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে খুব সম্ভব ডিনারের অর্ডার দিয়ে এলেন মেজর জেনারেল। খুশি হয়ে উঠল রানা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত শৌখিন মানুষ এই বৃদ্ধ, ভালমন্দ কিছু জুটবে আজ কপালে। রাঙার মার চেয়ে কোন অংশে কম যায় না বুড়োর এক্স-সার্ভিসম্যান বাবুর্চি। স্বাদ বদলটা জমবে আজ।

সামনের সোফায় বসলেন মেজর জেনারেল। সোজা চাইলেন রানার চোখে।

'কি বুঝলে?'

'যতদূর সম্ভব এই লোকই সোহানাকে নিয়ে গেছে, স্যার।'

'কোথায়?'

'কক্সবাজারের কাছাকাছি কোথাও। ঠিক কোথায় জানতে পারিনি চেষ্টা করেও।'

'চাকরি হয়েছে?'

'হয়েছে, স্যার।' পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে রাখল রানা সামনের টেবিলে। 'ছয় মাসের অ্যাডভান্স। কোনরকম রিসিট না রেখেই দিয়ে দিল।'

ভ্রু-কুঁচকে টাকাগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন মেজর জেনারেল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বললেন, 'টাকাগুলো দিয়ে দাও আমাকে, ক্যাজুয়ালটি ফাণ্ডে জমা করে নিই। কি বলো?'

কর্মচারীদের কেউ নিহত বা আহত হলে এই ফাণ্ড থেকে টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন মেজর জেনারেল। প্রচুর টাকা জমেছে ফাণ্ডে। আলতাফের বাবা-মার হাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে তুলে দেয়া হয়েছে এক লাখ সাত হাজার টাকা। ইনস্যুরেন্স বা অন্যান্য প্রাপ্য থেকে এটা সম্পূর্ণ আলাদা। এজেন্টরা যে যেখানে বাড়তি রোজগার করছে, সোজা এনে জমা দিচ্ছে এই ফাণ্ডে। শতকরা চল্লিশ ভাগ টাকা রানারই দেয়া। গেল এগুলোও। রানার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ওগুলো তুলে নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দিলেন মেজর জেনারেল।

টাকা পেয়ে বেশ খুশি খুশি মনে হলো বৃদ্ধকে। ধীরে সুস্থে পাউচ থেকে এরিনমোর মিক্সচার ভরলেন পাইপে, দাঁতে চেপে রনসন ভ্যারাফ্লেম গ্যাস লাইটার দিয়ে ধরিয়ে নিলেন পাইপটা। আধমিনিট চুপচাপ টানবার পর আবার সোজা চাইলেন রানার চোখের দিকে। দৃষ্টিটা চকচক করছে শান দেয়া ছুরির মত।

'অর্থাৎ, যা যা ঘটেছে রিপোর্ট করো।

শুরু করতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময় বাধা পড়ল। বেয়ারা এসে জানাল এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

যার-পর-নাই বিরক্ত হয়ে উঠলেন মেজর জেনারেল। 'যাও, বলে দাও ব্যস্ত আছি, এখন দেখা হবে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই, কিছু না, যখন তখন মানুষের বাসায় এসে হাজির হয়ে গেলেই হলো? কী যে সব লোক! কে? নাম বলেছে?'

'প্রফেসার গোলাম জিলানী,' কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল বেয়ারা।

নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ পাল্টে গেল বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তটস্থ হয়ে এদিক-ওদিক চাইলেন।

'তাই নাকি? উনি নিজে এসেছেন? নিয়ে এসো। নিয়ে এসো। ওঁকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন?' রানার দিকে ফিরে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ফিলসফির প্রফেসার। এখন রিটায়ার্ড। এখানেই বসাই, কি বলো? ও যে হঠাৎ এসে হাজির হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি।' দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন কয়েক পা। 'এই যে, প্রফেসার, এসো এসো।'

'কি ব্যাপার, সৈনিক, খুব ব্যস্ত আছ নাকি? কাজে বাধা দিলাম?'

'না না। এসো, আলাপ করিয়ে দেই। ইনি ডক্টর গোলাম জিলানী, আর এর কথা তোমাকে বহুবার বলেছি, এ-ই সেই মাসুদ রানা।'

পাতলা-সাতলা লম্বা ভদ্রলোক, মাথাভর্তি এলোমেলো ঝাঁকড়া চুল, নাইন্টিফাইভ পার্সেন্ট পাকা। সেকেলে ছাঁটের, কিন্তু দামী সার্জের স্যুট, কম বয়সে তৈরি করা হয়েছে বলে এখন একটু ঢিলে, চোখে পুরু কাচের চশমা, পকেটে চেনে বাঁধা ঘড়ি, বাম হাতে ছড়ি। উনিশশো দশ সালের আধুনিক সাজসজ্জা। রানা পরলে পাগল মনে করে ঢিল মারবে ছেলেরা, কিন্তু একে বেমানান লাগছে না। সেই যুগের অয়েল পেইন্টিং থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। মুখে একগাল শিশুসুলভ হাসি। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন কয়েক পা।

'আচ্ছা! তুমিই সেই ইয়ংম্যান! ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ...',

উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল রানা, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন প্রফেসার, সাঁৎ করে হাতটা টেনে নিয়ে পিছিয়ে গেলেন দুই পা। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছেন রানার দিকে, যেন ভূত দেখছেন।

হঠাৎ এই পরিবর্তনে রীতিমত বিস্মিত হলো রানা। বাড়িয়ে ধরা ডান হাতটা নিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। আড়ষ্টভাবে নামিয়ে নিল হাত।

কয়েক সেকেণ্ডেই সামলে নিলেন প্রফেসার জিলানী। আরও এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান, কিছু মনে কোরো না। ব্যাপারটা অভদ্রতার মত দেখাচ্ছে, কিন্তু আসলে তা না। তোমাকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পিশাচের প্রভাব রয়েছে তোমার ওপর।'

'পিশাচের প্রভাব!' অবাক হয়ে গেল রানা।

'হ্যাঁ। সেইজন্যেই তো ছুঁতে পারছি না। প্রেতলোকের ভয়ঙ্কর কোন পিশাচের প্রভাব।'

'তবেই তো সেরেছে!' ভয় পাওয়ার ভান করল রানা।

'না, না। আমি থাকতে কোন ভয় নেই।' আশ্বাস দিলেন প্রফেসার। 'কোথায় ছিলে তুমি বলো তো? কার সঙ্গে ছিলে এতক্ষণ?'

'মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে।' মৃদু হেসে বলল রানা।

হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন প্রফেসার জিলানী, সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইলেন মেজর জেনারেলের দিকে। 'বেড়ে বলেছে, কি বলো, রাহাত? অ্যাঁ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা!'

রানার উত্তরটা শোনামাত্র সামান্য এক টুকরো হাসি খেলে গিয়েছিল মেজর জেনারেলের ঠোঁটে, এখন আবার নির্বিকার, গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করছেন হাতে ধরা পাইপটা।

হাসি থামিয়ে আবার গম্ভীর হলেন প্রফেসার। 'হাসছি দুটো কারণে—প্রথমত চমৎকার একটা রসিকতা করেছ তুমি, মাসুম, দ্বিতীয়ত পরিষ্কার বুঝতে পারছি তুমি আমাকে পাগল ঠাউরেছ। এটাও একটা দারুণ হাসির ব্যাপার। না, ঠাট্টা নয়, আমি জানি, অশুচি স্পর্শ করেছ তুমি, কিন্তু আমার ডার্টি নোজ এতে পোক না করাই ভাল।' কথা বলতে বলতে রাহাত খানের দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ। 'চলি, রাহাত। না, বসব না। আমি আসলে তোমার সেই, কি নাম যেন, মেয়েটার কথা জানাতে এসেছিলাম। পেয়েছি, ওকে। ওকে পেয়েছি, কিন্তু দুঃসংবাদ আছে। খুব বিপদের মধ্যে আছে মেয়েটা। আগামী তিন দিনের মধ্যে উদ্ধার না করতে পারলে মারা পড়বে শাবানা।'

কান খাড়া হয়ে গেল রানার। বুঝতে পারল সোহানার কথা হচ্ছে। কিন্তু কোথা থেকে কিভাবে খবর সংগ্রহ করল এই বৃদ্ধ বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

স্পষ্ট উদ্বেগ ফুটে উঠল রাহাত খানের মুখে। 'কোথায়? কোথায় আছে সোহানা?'

'সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।' নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন প্রফেসার, 'চারপাশে অথৈ পানি দেখলাম। উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড একটা এলাকা।' চোখ দুটো বুজে এসেছে প্রফেসারের। 'কুৎসিত আর কদাকারের রাজত্ব সেখানে। বন্দী হয়ে আছে শাহানা। এই মামুনের মত ওর ওপরও রয়েছে অশুভ প্রভাব।' চোখ মেললেন প্রফেসার। 'চলি। এই খবরটা দেয়ার জন্যেই এসেছিলাম। তোমাদের কাজে হয়তো বাধা পড়ল, দুঃখিত। আবার দেখা হবে।'

'সেকি!' নড়ে উঠলেন মেজর জেনারেল। 'পালাই পালাই করছ কেন, জিলানী? বসো। রানার কাছেও কিছু খবর আছে, শোনা যাক। সেই সোহানার ব্যাপারেই।'

'না, যাই। আমার মুখে উদ্ভট কথাবার্তা শুনে এতক্ষণে মালেক হয়তো আমাকে পাগল-টাগল ঠাউরে বসেছে। সময় থাকতে কেটে পড়াই ভাল। কি বলো?' হো হো করে হাসলেন আবার প্রফেসার প্রাণখোলা হাসি। 'অবশ্য ডিনারের আশ্বাস পেলে হয়তো মত পরিবর্তন করতে পারি। বড় ভাল রাঁধে তোমার ওই···'

'নিশ্চয়ই। আমি এক্ষুণি বলে দিচ্ছি। বসো তুমি।' ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে গেলেন মেজর জেনারেল।

এই পাগলা প্রফেসারকে এত খাতির করতে দেখে রীতিমত অবাক হলো রানা। মেজর জেনারেল কি শেষ পর্যন্ত থিয়োসফির দিকে ঝুঁকছেন? বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরকালের চিন্তা বাড়ছে? নাহ্ সেভাবে কল্পনা করা যায় না বৃদ্ধকে। সত্যিই কি কোন গুণ দেখতে পেয়েছেন বৃদ্ধ এই পাগলার মধ্যে? তাই বা কি করে হয়? তন্ত্র মন্ত্র, ভূত-প্রেতের গল্প বলে শিশুর মন ভোলানো যায়, কিন্তু মেজর জেনারেল··· নাহ্।

একটা সোফায় বসে পড়লেন প্রফেসার। রানার দিকে চেয়ে হাসলেন মিষ্টি করে। বললেন, 'বসো, কি নাম যেন তোমার···ও, মেসবাহ্। আমার ব্যবহারে কিছু মনে করোনি তো? আসলে তোমাকে কিন্তু মোটেই পছন্দ হয়নি, মানে, অপছন্দ হয়নি আমার। ওই অশুভ প্রভাবটা খারাপ লাগছে। ওটা না থাকলে এতক্ষণে তোমার হাত দেখে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারতাম। এমনিতেও অনেক কিছুই বলতে পারি। এই যেমন, বিরাট একটা অনুভূতিপ্রবণ কৌতূহলী মন আছে তোমার, খুবই সাহসী ছেলে তুমি, এবং সৎ। অবশ্য সৎ লোক ছাড়া রাহাতের সঙ্গে ভাব থাকার কথা নয়। যাই হোক, বন্ধুর জন্যে প্রাণ দিতে দ্বিধা নেই তোমার। তুমি এমন একটা মানুষ, যার ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়। কিছু বয়সের দোষ আছে, কেটে যাবে আর একটু বড় হলে। মঙ্গল গ্রহের প্রভাব রয়েছে তোমার ওপর, সেজন্যে বিপদ, ভয় আর আতঙ্কে ভরা তোমার জীবন। আত্মরক্ষার জন্যে মারামারি কাটাকাটি ছাড়া তোমার উপায় নেই। যতই চেষ্টা করো না কেন, ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে থাকতে পারবে না তুমি। ঝামেলা, গোলমাল, শঙ্কা, উদ্বেগ লেগেই থাকবে সারা জীবন। যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হবে তোমাকে এই পৃথিবীতে।' এক টিপ নস্যি নিলেন প্রফেসার। 'কিন্তু ভাবছি, তুমি এই বিশ্রী অশুচির পাল্লায় পড়লে কি করে, মাশুক?'

'আপনি ভূত-প্রেত দৈত্য-দানো বিশ্বাস করেন বুঝি?' প্রশ্ন করল রানা।

'তুমি করো না?' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে যার-পর-নাই বিস্মিত হলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'তুমি জানো না এসব যে সত্যিই আছে? সারা দুনিয়ায় ব্ল্যাক আর্টের চর্চা আছে, জানো না তুমি?'

'কই না তো! সত্যিই আছে নাকি এসব? আমার তো ধারণা ছিল মধ্যযুগের উইচ হান্টিং-এ খতম হয়ে গেছে সব।'

'এতই সহজ?' রানার অজ্ঞতায় মাথা নাড়লেন প্রফেসার। 'তুমি এখনও অন্ধকারে আছ, মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান। কিচ্ছু জানো না তুমি। পশ্চিমা দেশে তো দিন দিন জোরদার হচ্ছে এই সব আধিভৌতিকের চর্চা। রীতিমত গবেষণা চলছে। বিরাট বিরাট সব বই লেখা হচ্ছে এর ওপর। রিচার্ড ক্যাভেনডিশের বই পড়েছ? এলিফাস লেভি বা অ্যালিস্টার ক্রলির নাম শুনেছ?' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে অনাবিল হাসি হাসলেন বৃদ্ধ প্রফেসার। 'ফ্রান্সের উইচ হান্ট শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। প্রথম বিচার হয় ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সের তোলুজে। তারপর

কত ধরা পড়ল, কত মারা গেল। কত মিথ্যা বিচার হলো, কত অন্যায় শাস্তি হলো। কিন্তু আসল প্রেত-সাধক ক'জনকে ধরতে পেরেছে?' আঙুল তুলে ক্যাঁচ কলা দেখালেন প্রফেসার। 'একটিও না।'

এক টিপ নস্যি নিয়ে নড়েচড়ে বসলেন প্রফেসার। 'আমার কাছে প্রচুর বই আছে ভাল ভাল। খুবই ইন্টারেস্টিং। পড়ে দেখো। চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যাবিলোনিয়ায় হিব্রু ভাষায় লেখা সেফার ইয়েতজিরা আছে আমার কাছে, আরমেনিয়াকে লেখা জোহার আছে এক কপি—১২৭৬-এ লেখা। হারমেস ট্রিসমেজিস্টাসের এমারেল্ড টেবিল আছে একখানা, অবশ্য অরিজিনালটা নেই, সেটা এমারেল্ডের ওপর ফিনিশিয়ান ভাষায় লেখা ছিল, আমার কাছে আছে ওটারই ল্যাটিন ভার্শান, ১২০০ খ্রীস্টাব্দে লেখা। শুরুটা বড় সুন্দর— quod superius est sicut quod inferious et quod inferious est sicut quod superius ad perpetranda miracula rei unius.

'অর্থাৎ, একের মাহাত্ম্য বুঝতে হলে জেনো, ওপরের যা কিছু নিচের মতই, আর নিচের যা কিছু তা ওপরের মতই। দারুণ না?' চকচকে চোখে রানার দিকে চাইলেন প্রফেসার। 'এ ছাড়াও আরও অনেক বই আছে আমার কাছে, একদিন বাসায় এসো, দেখাব। ফ্রান্সিস বেরেটের দি ম্যাগাস অর সিলেসটিয়াল ইন্টেলিজেন্সেস আছে, গ্রেট অ্যালবার্ট আছে, গ্রিমোরিয়াম ভেরাম আছে, গ্র্যাণ্ড গ্রিময়ের আছে, গ্রিময়ের অভ হনোরিয়াস আছে, রেড ড্র্যাগন আছে, টেস্টামেন্ট অভ সলোমন আছে—অনেক বই আছে, দারুণ মজার, তুমি এসো, দেখাব।'

'আপনি প্রেত সাধনা করেন?'

'ছি, ছি, ছি! তওবা, তওবা। আমি কেন এসব নোংরা কাজ করতে যাব? এসব কাজ খোদার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ, শয়তানের পূজা। শুধু নোংরা নয়, ভয়ঙ্করও। জানি আমি, কিন্তু করি না।'

'যে কেউ ইচ্ছে করলে করতে পারে? আমি পারব?'

'যে কেউ পারে না। বিশেষ সাইকিক পাওয়ার দরকার। কিন্তু তুমি পারবে চেষ্টা করলেই, তোমার মধ্যে সে ক্ষমতা আছে।'

'ইচ্ছে করলেই আমি প্রেতাত্মা ডাকতে পারব?'

'আলবত! খুব সহজ নিয়ম।'

'কি নিয়ম?' ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলেন মেজর জেনারেল। বসলেন একটা সোফায়।

'একটা কালো মুরগি সংগ্রহ করতে হবে যেটা কোনদিন মোরগের সংস্পর্শে আসেনি। মাঝরাতে সাদা কাপড় পরে ওটার গলা চেপে ধরে নিয়ে যাবে একটা তেরাস্তার মোড়ে। রাত যখন ঠিক বারোটা বাজবে তখন সাইপ্রেস গাছের ডাল দিয়ে তৈরি ছড়ি দিয়ে বেশ বড়সড় একটা বৃত্ত আঁকতে হবে মাটিতে। সেই বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা সাদা টুপি মাথায় দেবে। টুপির সামনেটায় থাকবে YHVH পেছনে লেখা থাকবে Adonai ডান দিকে লেখা থাকবে El আর বাঁ দিকে লেখা থাকবে Elohim । এইবার দুই হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হবে মুরগিটাকে, সেই

সঙ্গে বলতে হবে: ইউফাস মেটোহিম, ফ্রুগেটিভি এট এপেলাভি। এবার পূবদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে লুসিফার, বীজল্‌বুথ বা অ্যাস্টারথ, যাকে খুশি ডাকো—চলে আসবে।'

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল রানা। বলল, 'এসেই ঘাড়টা মটকে দেবে না তো আবার?'

নস্যি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন প্রফেসার, উত্তর দেয়ার আগেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন মেজর জেনারেল।

'এবার কাজের কথায় আসা যাক। শোনা যাক কি কি ঘটল আজ।' রানাকে প্রফেসারের দিকে চাইতে দেখে বললেন, 'এর সামনে বললে কোন অসুবিধে নেই।'

গত দু'দিনের ঘটনাগুলো অল্প কথায় পাগলা প্রফেসারকে বুঝিয়ে দিলেন মেজর জেনারেল, যেন রানার বক্তব্য বুঝতে অসুবিধে না হয়। নিভে যাওয়া পাইপটা ধরিয়ে নিলেন আবার। দুই টিপ নস্যি নাকে পুরে নড়েচড়ে বসলেন প্রফেসার গোলাম জিলানী। শুরু করল রানা।

কিন্তু সহজে শেষ করতে পারল না। প্রায় প্রতি পদেই বাধা দিলেন প্রফেসার, থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন। বাধা পেয়ে পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। যেসব কথা সামান্য ইঙ্গিতে সেরে অন্য কথায় যেতে চায় রানা, ঠিক সেগুলোই খপ করে ধরছে বুড়ো। দুর্গন্ধের কথা থেকেই শুরু হয়ে গেছে কৌতূহলী প্রশ্ন।

'কি রকম গন্ধ?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসার।

'খারাপ গন্ধ। কেমন ভ্যাপসা মত।'

'কি রকম খারাপ? মানে ঠিক কিসের মত ভ্যাপসা?'

চোখ বুজে চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'সেকেলে বাড়ির বন্ধ ভাঁড়ার ঘরে অনেকটা এই ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়। ছুঁচো, আরশোলা, চামচিকে, ইঁদুর—সব মিলিয়ে কেমন একটা বোঁটকা মত গন্ধ হয় না?—সেই রকম অনেকটা।'

'নিঃশ্বাসেও সেই একই গন্ধ? না ভিন্ন?'

'প্রায় একই রকম।'

'ঠিক আছে, বলে যাও। সরি ফর দা ইন্টারাপশান।' শুরু করেই আবার থামতে হলো রানাকে।

'টেবিলে নকশা? কি রকম নকশা?'

'গোলমত। ভিতরে একটা তারা আঁকা। কি সব যেন লেখা ছিল ওর ওপর, ঠিক মনে নেই। ওই নকশাটাই আবার দেখেছি ওর ব্রিফকেসের ভিতরের ডালায় আঁকা আছে। যাই হোক, হ্যাণ্ডশেক করে বসতে বলল, বসলাম…'

'নকশাটা এঁকে দেখাতে পারবে?'

একটু অবাক হলো রানা। বলল, 'না। এক ঝলক দেখেছি মাত্র।'

'আবার দেখলে চিনতে পারবে?'

'খুব সম্ভব পারব।'

'এক টুকরো কাগজ দাও তো, সৈনিক। আচ্ছা, ঠিক আছে কাগজ লাগবে না। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি মালেক, আমি বুঝে নেব। ভেতরের তারাটা

'কি পাঁচ কোণের, না ছয় কোণের?'

'খুব সম্ভব ছয় কোণের। নিচের দিকে দুটো শব্দ আছে ma আর ton। তার নিচে দুটো অক্ষর আছে L আর A।

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসার। 'বুঝতে পেরেছি। হেক্সাগ্রামটা হচ্ছে ডাবল সীল অফ সলোমন। মাঝখানে অদ্ভুত একটা নক্শার নিচে ইংরেজিতে বড় হাতের TAU লেখা আছে না?' রানাকে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতে দেখে বললেন, Tetragrammaton শব্দটাকে ভাঙা হয়েছে কৌশলে, নিচের দিকে পড়েছে ma আর ton। ওগুলো আলাদা কোন শব্দ নয়। আর, A হচ্ছে AGLA শব্দটার শেষ দুই অক্ষর। বাম দিকের ঘরে লেখা আছে Alpha আর ডান দিকের ঘরে Omega। বুঝে গেছি। যাক এবার বলো, আর বাধা দেব না।'

সত্যিই আর বাধা দিলেন না প্রফেসার, কেমন একটা গম্ভীর আত্মস্থ ভাব নিয়ে বসে রইলেন চুপচাপ। শুধু হাতের আংটির প্রসঙ্গে এসে একবার জিজ্ঞেস করলেন পাথরের চোখের কেন্দ্র বিন্দুটা লাল কিনা। রানা সম্মতি জানাতেই সোফায় হেলান দিয়ে বসে রইলেন চোখ বুজে, রানার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কিছুই বললেন না। বার দুই নস্যি নিলেন শুধু।

একটা কথাও না বলে দাঁতে পাইপ চেপে আগাগোড়া সবটা শুনলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। রানা থামতেই নামিয়ে রাখলেন পাইপটা।

'তুমি কি ভাবছ, রানা? কি করতে চাও এখন?'

'ভাবছি, রিসার্চ সেন্টারে না যাওয়া পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাবে না। একটা সূত্র যখন পাওয়া গেছে, এটা ধরেই এগিয়ে যেতে হবে যতদূর যাওয়া যায়।'

'লোকটাকে এখনি অ্যারেস্ট করবার কথা ভেবেছ?'

'ভেবেছি, স্যার। কিন্তু অ্যারেস্ট করতে গেলে যদি হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসে, তাহলে সূত্রটা হারিয়ে যাচ্ছে, সোহানার খবর আর পাওয়া যাচ্ছে না। তার চেয়ে ও যেখানে নিতে চায়, যাওয়াই ভাল মনে হচ্ছে।'

'সঙ্গে লোক নিতে চাও?'

'না, স্যার। একবার গোপন আস্তানাটা জানা হয়ে গেলে তখন লোক নেয়ার কোন অসুবিধে থাকছে না। কিন্তু লোকজন দেখে যদি ভড়কে গিয়ে গা ঢাকা দেয়, তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে।'

'ঠিকই বলেছ।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে না হয় কোন বিশেষ কাজের জন্যে চাকরি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সোহানাকে নিল কেন এবং কিভাবে, বুঝতে পারছ কিছু?'

আঁচ করতে পেরেছে রানা। প্রত্যেক অ্যাকটিভ এজেন্টকে ছ'মাস অন্তর অন্তর সম্মোহন করানো হয় বিসিআইয়ের হিপনোটিস্টকে দিয়ে। কোন অ্যাসাইনমেন্টে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে শত্রুপক্ষ যেন তাকে হিপনোটাইজ করে কোনরকম তথ্য সংগ্রহ করতে না পারে, তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। ছ' মাসের মধ্যে পৃথিবীর কারও পক্ষেই আর এদেরকে সম্মোহিত করা সম্ভব হবে না—এই রকম পোস্টহিপনোটিক সাজেশন দিয়ে দেয়া হয় হিপনোটিস্টের মাধ্যমে। খুব সম্ভব

সোহানাকে দেয়া হয়নি—তারই সুযোগ নিয়েছে শিকদার। এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে ওর হুট করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার?

একটু চুপ করে থেকে বলল রানা, 'কেন নিয়ে গেছে বুঝতে পারছি না, স্যার, তবে কিভাবে নিয়েছে, কিছুটা আঁচ করতে পারছি। খুব সম্ভব হিপনোটিজম। আমার অ্যান্টিহিপনোটিক সাজেশন রয়েছে, স্যার—ওর কি ছিল?'

'মনে হচ্ছে ঠিকই আঁচ করেছ। খুব সম্ভব ছিল না। গত এক বছর কোন অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়নি ওকে। কাজেই না থাকারই কথা।' ভুরু কুঁচকে ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, 'কেন নিয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে না। সেটা ওখানে না গেলে বোঝা যাবেও না। কাজেই প্রথমে তুমি একাই যেতে চাইছ ওখানে, তারপর প্রয়োজন হলে খবর দেবে, এই তো?'

'জ্বি, স্যার। সঙ্গে একটা মিনিয়েচার ওয়্যারলেস সেট নিয়ে নেব। খবর দিতে সুবিধে হবে। আপনার অনুমতি পেলেই কাল রওয়ানা হয়ে যেতে পারি।'

ঘাড় কাত করে প্রফেসারের দিকে চাইলেন মেজর জেনারেল। চোখ বুজে পড়ে আছেন পাগলা দার্শনিক, মনে হচ্ছে গভীর ঘুমে অচেতন। মৃদু হাসলেন মেজর জেনারেল। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ভাবছ, জিলানী?'

নিজের নাম শুনে চমকে চোখ মেলে চাইলেন প্রফেসার।

'কি বললে?'

'তুমি কি ভাবছ? রানা কাল রওয়ানা হতে চাইছে। তোমার কি মত?'

'নেগেটিভ।' একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে চুপ করে বসে রইলেন প্রফেসার।

আরও কিছু জানবার আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যখন দেখা গেল আর কিছু বলছেন না, তখন আবার প্রশ্ন করলেন রাহাত খান, 'একটু ভেঙে বুঝিয়ে বলো।'

'বুঝবে না। তুমি যদিও বা কিছুটা বুঝবে, মামুন তো কিছুই বুঝবে না।'

'তবু বলো না, শোনা যাক তোমার বক্তব্য।'

'এতক্ষণ মালেকের কথা শুনে যা বুঝলাম, তোমার সেই মেয়েটা, কি নাম যেন, ও হ্যাঁ, শরিফার ব্যাপারটা গন-কেস। কিছু করবার নেই আর। ওকে আর ফিরে পাবার রাস্তা নেই,' হাসলেন বৃদ্ধ। 'এখন এই মোস্তাককে পাঠালে, এ-ও শেষ হয়ে যাবে। আমও যাবে ছালাও যাবে।'

'তবু পরিষ্কার হচ্ছে না তোমার বক্তব্য। আর একটু ভেঙে বলো।'

এক টিপ নস্যি নিলেন প্রফেসার, তারপর বললেন, 'এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি, একটু আগে মোমেনের সঙ্গে যে পিশাচ সাধকের কথাবার্তা হয়েছে, তারই হাতে বন্দী হয়ে আছে সামিনা। পিশাচ-সাধনার কয়েকটি স্তর আছে, নকশা দেখে যতটা আন্দাজ করা যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় প্রচুর শক্তি অর্জন করেছে লোকটা, কিন্তু শেষ ধাপটা পেরোতে পারেনি এখনও। তিনদিন পর যে অমাবস্যা আসছে সেটাই সারা বছরের মধ্যে প্রেত-সাধকদের জন্যে সবচেয়ে ভাল লগ্ন। তার ওপর দিনটা পড়ছে ৩১ অক্টোবর। ভয়ঙ্কর দিন। সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে হলে ওই রাতে কুমারীর বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বের করে উৎসর্গ করতে হবে শয়তানের পায়ে। কুমারী বাদুড় বা ছাগলী হলেও চলে কিন্তু মোক্ষম সিদ্ধি লাভ হয় মানুষ বলি দিতে পারলে।

সাবিনাকে বলি দেয়া হবে এই অমাবস্যায়। সেই জন্যেই নেয়া হয়েছে ওকে। কারও সাধ্য নেই যে রুখতে পারে।'

মনে মনে হেসে খুন হয়ে গেল রানা। দুটোরই নাটবল্টু ঝরে গেছে মাথা থেকে। নইলে গম্ভীর হয়ে বসে বসে এসব পাগলের প্রলাপ শুনছেন কেন মেজর জেনারেল রাহাত খান? এই পাগলামি দেখতে নেহায়েত খারাপ লাগছে না, শুধু সিগারেট খাওয়া যাচ্ছে না, এই যা অসুবিধা। সোহানার সমূহ বিপদের কথা বলে মেজর জেনারেলকে একেবারে কাবু করে এনেছেন প্রফেসার। কাঁচুমাচু হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কোনদিক থেকে কোন উপায় আছে কিনা সোহানাকে বাঁচাবার। গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর এল 'নো, মাই ডিয়ার সোলজার। এখন ডিসিশন নিতে হবে, একজন গেছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, না দু'জনকেই হারাতে চাও।'

কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন মেজর জেনারেল এই কথা শুনে। বললেন, 'তুমি কোনরকম সাহায্য করতে পারবে না, জিলানী?'

'নাহ্। আমার ক্ষমতার বাইরে। প্রত্যেক পিশাচ-সাধকের নিজস্ব নাকি রিজিয়ন থাকে। সেখানে তারা সম্রাট। কারও সাধ্য নেই সেখানে তাদের ক্ষতি করে। নতুন লোক হলেও এক কথা ছিল, কিন্তু এই ব্যাটা বহুদূর এগিয়ে গেছে ওর পাপ-সাধনায়। ওকে ওর এলাকার বাইরে পেলে আমি একহাত দেখিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু ওর এলাকায় আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু। আমি কোন সাহায্য করতে পারব না...'

'এখনি কিছু একটা যদি করা যায়?' আশার আলো দেখতে পেয়েছেন মেজর জেনারেল। 'ঢাকাতেই...'

'উঁহুঁ।' মাথা নাড়লেন প্রফেসার। 'ও কি এখানে বসে আছে মনে করেছ? হাসালে দেখছি! ক-খো-ন চলে গেছে ওর এলাকায়। বিশ্বাস না হয় খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো।'

'অসম্ভব!' বলল রানা এতক্ষণে। 'ওকে ওয়াচ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হোটেল থেকে আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ওর কোথাও পালাবার উপায় নেই।'

হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হাসলেন প্রফেসার। হাসির দমক একটু কমতে বললেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখো না! দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ, হ্যারিংটন...'

ঝট করে টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে নিয়ে ডায়াল করল রানা।

জানা গেল অনেকক্ষণ কোন রকম সাড়াশব্দ না পেয়ে ডক্টর শিকদারের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেছে যে ঘরটা খালি, কেউ নেই ঘরে। হোটেলের চারপাশে প্রহরারত কোন লোকই শিকদারকে হোটেল ছেড়ে কোথাও যেতে দেখেনি। মনে হচ্ছে, হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে লোকটা। খবরটা মেজর জেনারেলকে জানাতেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওঁর চোখমুখ। হেসে ফেলল রানা।

'ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। পারে বলছি কেন, নিশ্চয়ই তাই করেছে সে কোন কৌশলে। আমাকে গার্ড দিলে আমিও এরকম হাওয়া হয়ে যেতে পারতাম। এর মধ্যে আধিভৌতিক কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

'যাই হোক,' আগের কথার খেই ধরলেন প্রফেসার, 'ঢাকায় নেই। কাজেই

ওকে শায়েস্তাও করা যাচ্ছে না। ওকে এলাকার বাইরে বের না করতে পারলে আমি কোন সাহায্যে আসতে পারছি না। অমাবস্যার আগে ওকে এলাকার বাইরে আনাও যাবে না। সালমাকে বাঁচাবার কোন পথ নেই, রাহাত, ওকে খরচের খাতায় লিখে রাখতে পারো।'

এতক্ষণ বুড়োর পাগলামিটা ভালই লাগছিল রানার কাছে, মজা পাচ্ছিল এসব ভৌতিক ব্যাখ্যা শুনে; কিন্তু এই ব্যাখ্যা যখন প্রায় প্রতিষ্ঠিত করে এনেছেন পাগলা প্রফেসার, যখন মেজর জেনারেলকে দুঃখ দিতে শুরু করেছেন,তখন কেন জানি হঠাৎ অসহ্য বোধ করল সে। সোজা চাইল রাহাত খানের চোখের দিকে।

'আপনি চিন্তা করবেন না, স্যার। কাল যাচ্ছি আমি। তিনদিনের মধ্যে ফিরে আসব সোহানাকে নিয়ে। লোকটা কতবড় পিশাচ দেখতে চাই আমি।'

'তা তুমি দেখতে পাবে, মোসলেম। এবং আমি বুঝতে পারছি, একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ তখন তোমার মত পাল্টানোর সাধ্য কারও নেই। তবে আমার পরামর্শ যদি চাও···'

'আপনার পরামর্শে খুব একটা কাজ হবে কি?'

'হবে, ইয়ংম্যান,হবে। অনর্থক রাগ কোরো না। আমি এতক্ষণ তোমাকে খ্যাপাবার চেষ্টা করছিলাম। আমি জানি, শাকিলাকে এখন যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে, সে হচ্ছ তুমি। ভড়কে গিয়ে পিছিয়ে আসো কিনা দেখছিলাম। যদি পিছিয়ে আসতে, সেটাও যে খুব আনওয়াইজ ডিসিশন হত, তা নয়। কিন্তু যাওয়াই যখন স্থির করেছ, আমার সাধ্যমত সাহায্য করব আমি তোমাকে। আমি একটা জিনিস দেব তোমাকে। সেটা সঙ্গে রাখলে পঁচাত্তর ভাগ কমে যাবে তোমার বিপদ। যদি অমাবস্যার আগেই পিশাচটার আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারো, তাহলে কোন অশুভ প্রভাব ফেলতে পারবে না সে তোমার ওপর।'

কোন জবাব দিল না রানা। এসব ভূত-প্রেতের কথা শুনতে আর ভাল লাগছে না ওর। বিদায় নেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বেয়ারা জানাল যে ডিনার রেডি হয়ে গেছে। না খাইয়ে ছাড়লেন না মেজর জেনারেল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ওর ডাটসান, সোহেলের লোক পৌঁছে দিয়ে গেছে। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখল দ্রুতপায়ে এইদিকে আসছেন মেজর জেনারেল। অদ্ভুত ব্যাপার, রানার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলেন বৃদ্ধ! জীবনে এই প্রথম।

'সত্যিই যাচ্ছো কাল, রানা?'

'যাচ্ছি, স্যার।'

'প্রেতাত্মায় মোটেই বিশ্বাস নেই তোমার, তাই না?'

'মোটেই নেই, স্যার। কিন্তু অনেকের যে বিশ্বাস আছে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জিলানী সাহেবকে দেখে। সেই লোকটারও যদি থাকে তাহলে ভয়ের কথা। এইসব উন্মাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। হয়তো সত্যি সত্যি সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশায় বলি দিয়ে বসবে সোহানাকে, কে জানে! কিছু একটা করে বসার আগেই ঠেকাতে হবে ওকে।'

'ওই লোকটার স্যাটানিক পাওয়ার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

সরাসরি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'আচ্ছা, স্যার, এই প্রফেসার জিলানীর মাথা-টাথা কি খারাপ আছে?'

অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইলেন বৃদ্ধ। তারপর চাপা, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'তোমার মাথা খারাপ! আশ্চর্য! ডক্টর গোলাম জিলানীর নাম শোনোনি তুমি? এত বড় পণ্ডিত সারা বাংলাদেশে আছে নাকি আর? বছর খানেক হলো দেশে ফিরেছেন আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে রিটায়ার করে। বিরাট ফিলসফার!' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরে বললেন মেজর জেনারেল, 'সেজন্যেই কেমন যেন ঘাবড়ে যাচ্ছি, রানা। এর কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দিতে পারছি না। বাজে কথা বলবার লোক···' আবার কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ। তারপর হঠাৎ বলে ফেললেন মনের কথাটা। 'থাক, রানা, যেয়ো না।'

'তাহলে সোহানার কি হবে, স্যার?'

'যা হয় হোক। সেজন্যে তোমাকে মরতে হবে কেন?'

'সহকর্মীর জন্যে এর আগেও তো অনেক ঝুঁকি নিয়েছি স্যার···'

'সহকর্মীর জন্যে ঝুঁকি নেয়াতে আমার আপত্তি নেই, রানা,' রানার কাঁধে আরেকটু চেপে বসল বৃদ্ধের হাত, 'কিন্তু তুমি আসলে ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ আমার জন্যে। তুমি মনে করেছ সোহানাকে হারালে ভেঙে পড়ব আমি, ভয়ানক আঘাত পাব। আমাকে খুশি করার জন্যেই যাচ্ছ তুমি। কিন্তু তুমি জানো না, তোমাকেও যদি হারাই, তাহলে সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে আমার।'

আজীবন ব্রহ্মচারী, কঠোর নীতিপরায়ণ, সত্যবাদী কট্টর বুড়োর মুখে এই কথাগুলো শুনে বুকের ভিতরটা কেমন যেন দুলে উঠল রানার। যার চোখের সামান্য ইশারায় হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে রানা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে, যার সামান্য একটু স্নেহের জন্যে কাঙাল হয়ে থাকে ওর মনটা, তার কাছে সে নিজেও যে কতবড় অমূল্য সম্পদ, সেটা উপলব্ধি করতে পেরে চোখের পাতা দুটো ভিজে গেল ওর। আপনা-আপনি টপাটপ কয়েক ফোঁটা জল ঝরে গেল চোখ থেকে। ঝিরঝির করে স্বর্গের শান্তি নামল যেন ওর অন্তরে। কোনমতে বলল, 'মরব না, স্যার। আপনি চিন্তা করবেন না। সোহানাকে নিয়েই ফিরব আমি।'

বৃদ্ধকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ঝটপট গাড়িতে উঠে পালিয়ে বাঁচল রানা।

সিগারেট ধরাল। বুক ভরে ধোঁয়া নিল। মনের খুশি বেরিয়ে আসছে হাসি হয়ে। আপনমনে একা একা হাসতে হাসতে বাসায় ফিরে চলল সে।

চার

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে দুপুর থেকে। আকাশ মেঘলা। ডিপ্রেশন।

পতেঙ্গায় নেমে গেল বেশিরভাগ যাত্রী, উঠল কয়েকজন। কক্সবাজারের

উদ্দেশ্যে আবার উড়াল দিল বাংলাদেশ বিমানের ফকার ফ্রেণ্ডশিপ।

খেলনার মত মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড জাহাজগুলোকে। মাল খালাসের জন্যে গভীর পানিতে নোঙর ফেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে ছবির মত। বাউরী বাতাসে শিরশিরে ঢেউ ওঠা দীঘি মনে হচ্ছে বঙ্গোপসাগরকে কয়েক হাজার ফুট উপর থেকে।

কুতুবদিয়া আর মহেশখালী দ্বীপের গায়ে আবছা ছায়া ফেলে আরও দক্ষিণে চলল প্লেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রয়েছে রানা। বিক্ষিপ্তভাবে নানান টুকরো চিন্তা ঘুরছে মাথার মধ্যে।

পাগলা প্রফেসারের কথা মনে আসতেই মুচকি হাসি খেলে গেল রানার ঠোঁটে। এত বড় পণ্ডিত হয়েও এইসব বাজে কুসংস্কারকে শুধু প্রশ্রয় দেয়া নয়, রীতিমত বিশ্বাস করতে পারে কেউ; বিংশ শতাব্দীর এতগুলো বছর পার করেও অশুভ আত্মা, প্রেত আর পিশাচ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ, সেকথা ভাবতে অবাক লাগে ওর। এতবড় জ্ঞানী লোকের পক্ষে···

তাবিজের মত কি একটা ছোট্ট কাপড়ের পুঁটুলি পাঠিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তাও আবার সোহেলের মাধ্যমে। আজ দুপুরে। দেখতে ছোট্ট একটা বালিশের মত। হেসে খুন হয়ে গিয়েছিল রানা। দূর দূর করে ভাগিয়ে দিয়েছে রানা ওকে। বলেছে, 'আর যাই হোক, তাবিজ বাঁধতে পারব না হাতে। সোজা গিয়ে আমাদের বুড়োর গলায় বেঁধে দে গে যা। ওঁরই ভূত ছাড়ানো দরকার আগে।'

'বড় সাহেব বিশেষ করে বলে দিয়েছে, দোস্ত। আমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, এটা অফিশিয়াল অর্ডার।'

'অর্ডার তো হতেই পারে না, বল্—অনুরোধ। আমি এই বালখিল্য অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছি। এসব কুসংস্কার বিশ্বাস করে বোকা বনার চেয়ে ভূত-প্রেতের হাতে প্রাণ দেয়াও অনেক ভাল। তোরা পাগল পেলি নাকি আমাকে?'

বিফল হয়ে ফিরে গেছে সোহেল। রানা জানে ফিরে গেছে, কিন্তু পিছন দরজা দিয়ে ফিরে এসে দশ মিনিট ধরে রাঙার মা'র সাথে কি ফিসফাস করেছে সোহেল জানা নেই ওর, ছোট্ট বালিশটা ওর হাতে দিয়ে কোন্ বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছে টেরও পায়নি সে। ওটা যে এখন ওর লাল স্ট্রাইপের হলুদ জ্যাকেটের কলারের মধ্যে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে, তা টের পেলে আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলত সে সোহেলের মাথা।

শিকদারের চেহারাটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। সত্যি, লোকটার মধ্যে ভয়ঙ্কর নারকীয় কি যেন আছে। পিশাচ শব্দটার সাথে আশ্চর্য মিল আছে ওর চেহারার। মোটেই পছন্দ হয়নি রানার। মনে হয়েছে পৃথিবীর জঘন্যতম নীচ কাজ করতেও রুচিতে বাধবে না এই লোকের। কী চায় লোকটা? কেন ধরে নিয়ে গেছে সোহানাকে? রিসার্চ স্কলার দিয়েই বা কি করবে সে?

এয়ারপোর্টে সত্যি ওর লোক অপেক্ষা করবে তো? নাকি টের পেয়ে গেছে রানার জালিয়াতি?

সামনের দেয়ালে জ্বলে উঠল 'নো স্মোকিং' সাইন, তার নিচে জ্বলছে সীট বেল্ট বাঁধবার নির্দেশ। পরমুহূর্তে এই কথাগুলোকেই প্রতিগ্রাহ্য করবার জন্যে

স্পীকারের মাধ্যমে ভেসে এল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে টিপে মেরে বেল্ট বেঁধে প্রস্তুত হলো রানা। ল্যাণ্ড করল ফকার ফ্রেণ্ডশিপ।

রেইনকোট পরা একজন লোক এগিয়ে এল। টুপিটা নিচে টেনে দেয়ায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না মুখ। বিচ্ছিরি কর্কশ ভ্যাড়ভেড়ে কণ্ঠে বলল, 'আপনি ডক্টর মাসুদ রানা?'

'জ্বী।'

'আসুন আমার সাথে।'

রানার হাতের স্যুটকেসটা প্রায় জোর করেই ছিনিয়ে নিল লোকটা। এবং এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। রানা বেরিয়ে এল এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে ওর পিছু পিছু।

গাড়ি নেই। বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচবার জন্যে হুড তুলে দিয়ে সীটের ওপর পা উঠিয়ে কুঁকড়ে বসে ছিল রিকশাওয়ালা—ওদের এগোতে দেখে নেমে গেল সীট থেকে। প্রথমে রানা উঠল, তারপর স্যুটকেসটা পায়ের কাছে রেখে উঠে এল রেনকোট পরা লোকটা।

কক্সবাজার থেকে ঈদগাঁও যাবার শর্টকাট রাস্তা ধরে চলল রিকশা। মাইল দুয়েক গিয়েই মোটরবোটটা চোখে পড়ল রানার। হালকা অ্যাশকালার পেইন্ট করা বেশ বড়সড় বোট। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। নোঙর ফেলা আছে তীরে। এতক্ষণ কেউ কোন কথা বলেনি, এইবার চাপা গলায় রিকশাওয়ালাকে থামতে বলল পাশের লোকটা। থেমে দাঁড়াতে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিল। রানা কিছু বলবার আগেই এক হ্যাঁচকা টানে স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে। এক মুহূর্তের জন্যে লোকটার মুখের কিছুটা অংশ দেখতে পেল রানা। ভিতর ভিতর শিউরে উঠল সে। সারাটা মুখ ক্ষতবিক্ষত, ভয়ঙ্কর। সাদা হয়ে আছে কাটা দাগগুলো, মনে হচ্ছে সার্জিক্যাল নাইফ দিয়ে কেউ নক্সা এঁকেছে লোকটার মুখের উপর, ইচ্ছাকৃতভাবে বীভৎস করে তুলেছে মুখটা।

মাথা নুইয়ে যথেষ্ট ভদ্রতার সাথে রানাকে এগোবার জন্যে ইঙ্গিত করল লোকটা। পিছন ফিরে দেখল রানা রিকশা ঘুরিয়ে নিয়ে বেশ অনেকদূর চলে গিয়েছে রিকশাওয়ালা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঢাল বেয়ে নেমে গেল রানা, বালির উপর দিয়ে চলল লোকটার পিছু পিছু।

ঝির ঝির পড়েই চলেছে বৃষ্টি। সমুদ্রের বেশিদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ঢেউগুলো বেশ বড়।

একটা কাঠের সিঁড়ি নামিয়ে দিল লোকটা রানার উঠবার সুবিধের জন্যে। রানা উঠে আসতেই তুলে ফেলল নোঙর। সিঁড়ি দিয়ে লগির মত করে ঠেলা দিয়ে চলে এল অপেক্ষাকৃত গভীর পানিতে। তারপর স্টার্ট দিল ইঞ্জিন। ছোট্ট একটা গর্জন করেই স্টার্ট হয়ে গেল শক্তিশালী ইঞ্জিন। পশ্চিম দিকে মুখ করে ছুটল মোটরবোট সোজা সমুদ্রের দিকে। বিশ মিনিটের মধ্যেই আবছা হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল তীরের চিহ্ন। এখন চারদিকে শুধু অথৈ জল।

চট করে প্রফেসার জিলানীর একটা কথা মনে পড়ল রানার—চারপাশে অথৈ

পানি দেখলাম।

'কোথায় চলেছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা লোকটাকে।

রেইনকোট খুলে ফেলেছে লোকটা। টুপিটাও খুলে ফেলেছে। মেঘলা শেষ-বিকেলের ম্লান আলোয় আরও বীভৎস লাগছে মুখটা। সোজা রানার চোখে চোখ রেখে হাসল। আন্তরিক হাসি, কিন্তু দেখলে পিলে চমকে যাবে যে কোন লোকের। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'যেদিকে দু'চোখ যায়··· সেই ঘাটে ভেঁড়ে তরী!' চকচকে চোখে চাইল রানার দিকে। 'কী, মনে পড়েছে? চিনতে পেরেছেন? এই ডায়ালগটাই বলেছিলাম নায়িকাকে মরুতে শুখায় নদী ছায়াছবিতে। দেখেছেন ছবিটা?'

'আপনি সিনেমা করেন বুঝি? দুঃখিত। ছবি দেখার সময় পাই না খুব একটা। আপনাকে ঠিক···'

'নাম বললেই চিনতে পারবেন। আমার নাম উলফাত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বিখ্যাত নায়ক উলফাত। একসময় আমাকে দেখার জন্যে ভিড় জমে যেত রাস্তায়, পাগল হয়ে উঠত মেয়েরা কে কার আগে অটোগ্রাফ নেবে। আমার আবৃত্তি শোনার জন্যে হাজার হাজার শ্রোতা রেডিও খুলে বসে থাকত। শুনবেন? শুনবেন একটা আবৃত্তি?' রানার উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই শুরু করে দিল লোকটা। কর্কশ ফ্যাসফেঁসে ভাঙাচোরা কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হলো, 'আমি বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত, আমি সেইদিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না, আমি বিদ্রোহী···'

দুই হাতে নিজের কান চেপে ধরতে ইচ্ছে করল রানার। বরফের মত জমে গেছে সে। স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে লোকটার মুখের দিকে। আশ্চর্য! নানান জায়গায় উলফাতের ছবি দেখেছে রানা। সোহেলের ফাইলেও দেখেছে গতকাল। মুখের আদলটা কিন্তু মিলে যাচ্ছে অবিকল! এই লোকই সেই নায়ক? রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়েছিল কয়েক মাস আগে। এই অবস্থা হলো কি করে চেহারার?

হঠাৎ মাঝপথে আবৃত্তি থামিয়ে খলখল করে খানিকক্ষণ হাসল লোকটা ভয়ঙ্কর পৈশাচিক হাসি। পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আশ্চর্য! তাই না?' উত্তরের প্রতীক্ষা না করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সিগারেট ধরাতে।

চুপ করে বসে রইল রানা। লোকটাও আর কোন কথা বলল না অনেকক্ষণ। ঝিরঝির বৃষ্টি, বোটের গায়ে ঢেউয়ের ছলছলাৎ, আর ইঞ্জিনের চাপা গোঙানি। পশ্চিম দিকে মুখ করে ছুটে চলেছে মোটরবোট। আরও আবছা হয়ে আসছে চারিটা পাশ। আঁধার হয়ে যাবে খানিক বাদেই।

একটা সিগারেট ধরাল রানা। আপন মনে টানল কিছুক্ষণ, তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'কোনদিকে চলেছি আমরা? মহেশখালী, না সোনাদিয়া—কোনদিকে?'

'সোনাদিয়া।' বিকৃত মুখে আবার হাসল লোকটা। 'এসে গেছি প্রায়।'

ছোট দ্বীপ সোনাদিয়া। মাইল চারেক লম্বা, আর চওড়া হবে বড়জোর আধ মাইল থেকে পৌনে একমাইল। মগ জলদস্যুদের তৈরি বহুকালের পুরানো একটা

দুর্গ আছে এখানে। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দ্বীপের উত্তর দিকে কিছু জনবসতি ছিল। কোনও এক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে গেছে সব। আর বাসা বাঁধেনি কেউ।

ধীরে ধীরে রানার চোখের সামনে ভেসে উঠল দ্বীপটা। পাহাড়ী দ্বীপ। তীর থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা টিলার ওপাশে দেখা যাচ্ছে দুর্গের চূড়োটা। বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় ভয়ানক বিষণ্ণ মনে হচ্ছে দ্বীপটাকে। মোটরবোটের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল ভয়ঙ্কর-দর্শন লোকটা। কাছাকাছি আসতে রানা লক্ষ করল ছোট্ট একটা জেটি তৈরি করা হয়েছে মোটরবোট ভিড়াবার জন্যে, ব্রেকওয়াটারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে সমুদ্রের কিছুটা অংশে।

ঘাটে ভিড়তেই লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল রানাকে। 'উঠে পড়ুন। আমি আপনার স্যুটকেস নিয়ে আসছি। হাঁটতে হবে বেশ খানিকটা। চড়াই উৎরাই আছে।'

নেমে পড়ল রানা। চমৎকার সব শঙ্খ, ঝিনুক আর কড়ি বিছিয়ে রয়েছে বালুকা বেলায়। বৃষ্টিতে ভিজে চকচক করছে। কুড়োবার লোক নেই। খানিক দূরে, যেখানে ব্রেকওয়াটার নেই, পাহাড়ী তীরের উপর সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। গোটাকয়েক সী-গাল উড়ছে মাথার উপরে, ঘাড় কাত করে শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ করছে রানাকে। শোক-সঙ্গীতের মত লাগছে ওদের ডাক। নোঙর ফেলে বোটটা একটা খুঁটির সাথে বেঁধে নেমে এল ভয়ঙ্কর লোকটা, হাঁটতে শুরু করল রানার পিছু পিছু।

এবড়োখেবড়ো পায়ে চলা পথ। উঁচু নিচু। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দ্রুত পা চালাল রানা। টিপ টিপ বৃষ্টি, সমুদ্রের গর্জন আর সী-গালের উদাস কান্না বিষাদময় করে তুলেছে অবসন্ন সন্ধ্যাকে। কেমন যেন একটা ছমছমে ভাব চারপাশে। রানার পায়ের সাথে তাল মিলিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে ভয়ঙ্কর লোকটা। রানা ভাবল স্যুটকেসটা বইতে কষ্ট হচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু পিছন ফিরতে গিয়ে কেমন যেন ভয় ভয় লেগে উঠল ওর। আছে তো লোকটা? পায়ের শব্দ পাচ্ছে না কেন সে? এটা উনফাতের প্রেতাত্মা নয় তো! নিজের এই ছেলেমানুষী ভাবনায় হেসে ফেলল রানা। ফুঁ দিয়ে মন থেকে উড়িয়ে দিল চিন্তাটা। চাইল পিছন ফিরে। দেখল সবক'টা দাঁত বের করে হাসছে লোকটা ওর দিকে চেয়ে।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কষ্ট হচ্ছে? দেবেন ওটা আমার হাতে?'

'আরে না। এসে গেছি। এগোন আপনি।'

দূর থেকেই দেখতে পেল রানা, প্রাচীরের মাথায় তিন সারি তার। চিন্তার গতি দ্রুততর হলো রানার। নিশ্চয়ই ইলেকট্রিফায়েড? এত উঁচু প্রাচীর, তার উপর বৈদ্যুতিক তার—ব্যাপার কি? জলদস্যুদের ভয়, নাকি অন্য কোন কারণ? কি আছে এই দুর্গের ভেতর খোয়া যাবার মত?

আর একটু এগিয়ে কারণটা বুঝতে পারল রানা। বিশাল প্রাচীরটা পাথর দিয়ে তৈরি। চেষ্টা করলে পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে এ দেয়াল বেয়ে ওঠা বা নামা সম্ভব, তাই এই বাড়তি সাবধানতা। কিন্তু বোঝা গেল না ঠিক কাদের রুখতে চায়

ডক্টর শিকদার, কেন এই সাবধানতা?

একটা প্রকাণ্ড স্টীলের দরজার সামনে এসে শেষ হয়েছে রাস্তা। দেয়ালের গায়ে বসানো একটা বোতাম টিপল পিছনের লোকটা স্যুটকেস মাটিতে নামিয়ে রেখে। প্রায় সাথে সাথেই ঘটাং করে বল্টু খোলার শব্দ হলো, তারপর ধীরে ধীরে খুলে গেল ভারি কবাট।

চমকে উঠল রানা গেটের ওপাশে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে। এক নজরেই চিনতে পারল সে। গুলজার বেগ! বিস্ফারিত চোখে লোকটার দিকে চেয়ে রইল রানা। এই অবস্থা হলো কি করে! পরিষ্কার মনে আছে রানার, গতকাল সকালেই সোহেলের ফাইলে দেখেছে সে গুলজারের ছবি, পড়েছে চেহারার বর্ণনা। এ কি করে সম্ভব! চেহারাটা ঠিকই আছে, কিন্তু শরীরটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বেড়ে গেছে দেড়গুণ। বিকট এক দৈত্যের আকার। প্রায় আট ফুট লম্বা, হাফ প্যান্ট পরা বিশাল এক দানব। সারা শরীরে কিলবিল করে উঠছে পাকানো দড়ির মত শক্তিশালী পেশী। মাথায় চুল নেই একগাছিও, চকচক করছে গোলাপী মাথা, মুখটা বিকৃত করা হয়েছে সার্জিক্যাল নাইফ দিয়ে। ভয়ঙ্কর। হাতে এক গোছা চাবি।

রানাকে থমকে যেতে দেখে খল-খল করে হেসে উঠল পিছনের লোকটা। 'ওকে ভয় পাবার কিছুই নেই, ডক্টর মাসুদ রানা। ও কিছু বলবে না আপনাকে।' আবার হাসল। মনে হলো দশজন লোক হাসছে বিভিন্ন স্কেলে। 'তাছাড়া বলবেই বা কি করে? জিভ নেই তো ওর। কথা বলতে পারে না।'

পিছন থেকে রানার পিঠে ঠেলা দিল উলফাত। কয়েক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল রানা, পিছন ফিরে চাইল আবার দৈত্যটার দিকে। প্রকাণ্ড স্টীলের দরজা অনায়াসে একহাতে টেনে বন্ধ করে দিল গুলজার বেগ, ঝটাং করে বল্টু লাগাল, তারপর মস্ত এক তালা লাগিয়ে দিয়ে ফিরল রানার দিকে।

দৌড়ে পালাবার একটা আন্তরিক তাগিদ সামলে নিল রানা বহু কষ্টে। হঠাৎ নিজেকে মনে হলো ফাঁদে আটকে পড়া ইঁদুরের মত। অসহায়। বন্দী। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সে।

আবার হেসে উঠল উলফাত। 'খামোকা ভয় পাচ্ছেন। গুলজারের মত নিরীহ লোক আর দু'টি হয় না। অবশ্য মনিবের হুকুম পেলে ওর মত ভয়ঙ্কর···' কথাটা বলতে বলতে থেমে গেল উলফাত, তারপর আবার বলল, 'যাই হোক, আপনার ভয়ের কিছুই নেই। কিচ্ছু করবে না ও। চলুন এগোনো যাক।'

পা বাড়াল রানা। একশো গজ দূরে দুর্গ-তোরণ। আবছা আঁধারে পোড়ো বাড়ি মনে হচ্ছে দুর্গটাকে। নিঝুম। আলো নেই। দুটো ব্যাপার জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে। এক, শুধু চেহারার আশ্চর্য মিল বা দৈব-সংযোগ নয়, এরা দু'জন সত্যিই উলফাত এবং গুলজার, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে পড়ে এরা নিজেদের চেহারার বিকৃতি সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। আর দুই, ডক্টর শিকদার নিঃসন্দেহে এক ভয়ঙ্কর লোক। শুধু ভয়ঙ্কর নয়, প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী। এর সাথে টক্কর দেয়া সহজ কাজ হবে না।

হঠাৎ দপ করে বাতি জ্বলে উঠল। দুর্গ-তোরণের সামনে গজ পঞ্চাশেক জায়গা

ঝলমল করে উঠল উজ্জ্বল আলোয়। রানা দেখল একটা বাগানের মাঝখান দিয়ে খোয়া বিছানো পথ ধরে চলেছে ওরা দুর্গ-তোরণের দিকে।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। সাথে সাথে থেমে দাঁড়াল পিছনের দু'জনও। শিরশির করে একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল রানার শিরদাঁড়া বয়ে। বাগান ভাবছে সে কাকে! প্রতিটা গাছ যেন ভয়ঙ্করের প্রতিমূর্তি। ডালগুলোকে ইচ্ছেকৃতভাবে দুমড়ে মুচড়ে বাঁকিয়ে বিকট আকৃতি দেয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে অকল্পনীয় নির্যাতন সহ্য করছে ওরা ঘাড় গুঁজে। ধুঁকছে। নানান ধরনের ছোট বড় চেনা অচেনা গাছ নুয়ে রয়েছে অস্বাভাবিক কুৎসিত ভঙ্গিতে। ভয়ঙ্কর লাগছে ওদের দেখতে। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর লাগছে ফুলের বেডগুলোকে। ফুলগুলো এমন ভাবে সাজানো, মনে হচ্ছে সারা মাঠ জুড়ে শুয়ে আছে অসংখ্য নর-কঙ্কাল। দাঁত বের করে হাসছে কঙ্কালগুলো। বাতাসে নড়ছে ফুলগুলো, মনে হচ্ছে নড়ছে সবকটা কঙ্কাল, জ্যান্ত, উঠে আসবে এখুনি দু'হাত বাড়িয়ে।

একটা বোঁটকা গন্ধ এল রানার নাকে। রানা বুঝতে পারল গন্ধটা আসছে এইসব গাছপালা থেকেই। দিন ফুরোতেই বিষাক্ত গ্যাস ছাড়তে শুরু করেছে এরা।

কুৎসিত আর কদাকারের রাজত্ব সেখানে—আত্মভোলা প্রফেসারের কথাগুলো মনে পড়ল রানার।

'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, চলুন? বেশিক্ষণ এই গন্ধ নাকে গেলে উন্মাদ হয়ে যায় মানুষ। এগোন, জলদি!'

ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে রানার কাছে, সাংঘাতিক এক বিকৃত মস্তিষ্ক নরপশুর পাল্লায় পড়েছে সে। রানার কাছ থেকে কিছুই গোপন করবার প্রয়োজন নেই ডক্টর শিকদারের। রানা এখন ওর হাতের মুঠোয়। দেখুক রানা, দেখে নিজের অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করে নিক যত দ্রুত সম্ভব।

বোঁটকা গন্ধটা তীব্রতর হচ্ছে। দম আটকে আসতে চাইছে। দ্রুত পা বাড়াল রানা।

বিশ ফুট চওড়া একটা পরিখা ঘিরে রেখেছে দুর্গটাকে। রানা কাছাকাছি পৌঁছতেই প্রায় নিঃশব্দে নেমে এল একটা সেতু। পরিখার পানির দিকে চেয়েই ঘেন্নায় গাটা রি রি করে উঠল রানার। প্রায় সবুজ পানি, অসংখ্য কৃমি জাতীয় পোকা কিলবিল করছে সে পানিতে। বিজবিজ করছে সারাটা পরিখা কোটি কোটি নোংরা কীট শ্বাস নেয়ার জন্যে উঠছে আর নামছে বলে। চট করে চোখ সরিয়ে নিয়ে এগোল রানা সেতুর উপর দিয়ে।

এপারে পৌঁছতেই সেতুটা উঠে গেল আবার।

হঠাৎ নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো রানার। মনে হলো বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে। ফিরে যাবার উপায় নেই। এতসব কর্মকাণ্ডের হোতা এই ক্ষমতাশালী উন্মাদের হাত থেকে মুক্তি পাবে না সে কোনদিন। কোনদিন ফিরে যেতে পারবে না আর সুস্থ, স্বাভাবিক পৃথিবীতে। সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছে সে, ফেরার পথ নেই।

খুলে গেল দুর্গের প্রকাণ্ড কাঠের তোরণ। ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছে

সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক যুবতী নারী। অপূর্ব সুন্দর ফিগার। মুখে অদ্ভুত ধরনের একটা মুখোশ আঁটা। সারাটা মুখ ঢাকা। চোখের জায়গায় শুধু ছোট্ট দুটো ফুটো।

ধক করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। সোহানা নয় তো! এখুনি যদি পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায় রানার? যদি বাঁচাও আমাকে বলে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকের ওপর? তাহলেই সর্বনাশ! দু'জনই ডুববে এক সাথে।

কিন্তু রানাকে চিনতে পারার কোন লক্ষণ দেখা গেল না মেয়েটার মধ্যে। আঙুল তুলে দোতলার সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল স্যুটকেসধারী উলফাতকে, আশ্চর্য সুরেলা, মিষ্টি কণ্ঠে বলল, 'ওর ঘরে নিয়ে যাও ওটা। গুছিয়ে রাখো।' রানার দিকে ফিরল এবার। 'আসুন। এদিকে।' বলেই পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল ডান দিকের একটা করিডর ধরে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রানা। না, সোহানা নয়। কণ্ঠস্বরটা সোহানার মতই মিষ্টি এবং পরিষ্কার, কিন্তু উচ্চারণটা অদ্ভুত। কেমন যেন জড়ানো, মনে হয় কথা বলবার সময় ঠোঁট নাড়ছে না মেয়েটা।

উলফাত রওনা হয়ে গেছে দোতলার সিঁড়ির দিকে, রানা চাইল গুলজারের দিকে। লোলুপ দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে চেয়ে রয়েছে দৈত্য। যেন গোগ্রাসে গিলছে। চকচক করছে চোখ দুটো, নোংরা, হলদে দুই সারি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। চকচকে চোখে ফিরল রানার দিকে, মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল, যাও ওর সাথে। রানা লক্ষ করল, লোকটার উপর সারির দুটো দাঁত অন্যগুলোর চেয়ে একটু বড়।

একটা মোড় ঘুরে চলার গতি একটু কমিয়ে দিল মেয়েটা, রানা কাছে আসতেই থেমে দাঁড়িয়ে ফিরল ওর দিকে, মনে হলো যেন একটু ইতস্তত করল, তারপর আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা দরজায় টোকা দিল তিনটে, অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা, মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল রানাকে ভিতরে যাবার জন্যে। মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল রানা ঘরের ভিতর।

একটা ডাইনিং টেবিলে বিভিন্ন রকমের চমৎকার সব খাবার ভর্তি ডিশ সাজানো। সুগন্ধ ছুটেছে।

টেবিলের ওপাশে দরজার দিক মুখ করে বসে আছে সোহানা। কুৎসিত আর কদাকারের দেশে অপূর্ব সুন্দর এক শ্বেতপদ্মের মত।

পাঁচ

চোখ টিপল সোহানা।

থমকে দাঁড়াল রানা। লক্ষ করল, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসে আছে সোহানা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ধনুকের ছিলার মত টান হয়ে রয়েছে ওর প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায়। চোখের কোলে কালি।

বোকার মত এদিক-ওদিক চাইল রানা। ঘরে আর কেউ নেই। পিছনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে দিগম্বর মেয়েটা। কি করবে বুঝতে পারল না রানা। কোন

ব্যাপারে সাবধান করছে সোহানা ওকে চোখ টিপে? রানার মত সে-ও কি ভয় পাচ্ছে, মুহূর্তের ভুলে পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গিয়ে সমূহ বিপদ ঘটে যেতে পারে? সারা ঘর ঘুরে সোহানার উপর এসে স্থির হলো রানার দৃষ্টি। পূর্ব পরিচিতির কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না সে দৃষ্টিতে। কিছুটা বিব্রত ভাব।

ঘরের কোণে কি যেন নড়ে উঠল।

একটা বুক শেলফের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল ডক্টর শিকদার। রানা বুঝল, ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করবার জন্যেই এই কৌশল অবলম্বন করেছিল শিকদার। আড়ালে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিল এতক্ষণ।

হাসিমুখে এগিয়ে এল শিকদার। 'হ্যালো, ডক্টর মাসুদ! আসুন, আসুন। ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ! পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?' হাত বাড়াল হ্যাণ্ডশেকের জন্যে। 'এখানে আমরা একটু সকাল সকাল খাই। আসুন বসে পড়া যাক। অসুবিধা নেই তো কোন?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঠাণ্ডা হাতটা শেক করল রানা। 'না, না। অসুবিধা নেই। বরং সুবিধা। অনেক রাত অবধি কাজ করি তো, সকাল সকাল খেয়ে নিলেই ভাল হয়।'

'দ্যাটস গুড।' এগিয়ে গিয়ে সোহানার পাশে একটা চেয়ারে বসবার ইঙ্গিত করল শিকদার রানাকে, নিজে বসল অপর পাশে। 'তবে আগামী দু'তিনদিন কোন কাজ নেই আপনার। ঘুরে ফিরে দেখুন পুরোটা এলাকা, কি ধরনের কাজ হয় এখানে সে সম্পর্কে একটা আইডিয়া করে নিন, আপনার রিসার্চ সম্পর্কেও কিছু কিছু আলোচনা করা যাবে, কিন্তু কাজ নয়। দেখুন সবকিছু, মনটা বসুক, তারপর কাজ শুরু করব আমরা ১লা নভেম্বর থেকে। কি বলেন? এ মাসের বাকি দু'তিনটে দিন আমি একটু ব্যস্ত···' হঠাৎ থেমে গিয়ে সোহানার দিকে ফিরল শিকদার। 'ছি, ছি! আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিইনি বুঝি এখনও? ইনি হচ্ছেন মিস সোহানা চৌধুরী, আমার অতিথি; আর ইনি ডক্টর মাসুদ রানা, আমাদের নতুন রিসার্চ স্কলার।'

ভদ্রতার হাসি হেসে সামান্য একটু মাথা ঝাঁকাল রানা।

দরজার মাঝখানে তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে উলঙ্গ মেয়েটা। এবার তার দিকে ফিরল শিকদার।

'কই, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পূরবী? প্লেটগুলো সাজিয়ে ফেলো।'

ঝট করে পাশ ফিরে চাইতে যাচ্ছিল রানা, সামলে নিল। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল বিখ্যাত অভিনেত্রী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের দিকে। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে পূরবী। অপূর্ব ছন্দ চলার ভঙ্গিতে, বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই, আড়ষ্টতা নেই, যেন স্বপ্নের ঘোরে আছে। মুখে মুখোশ। একে এইভাবে রাখা হয়েছে কেন এখানে?

যেন রানার অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, এই ভাবে বলল শিকদার, 'ওকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে থাকতে হচ্ছে এখানে।'

'কেন?' চট করে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কারণ চিত্র জগতে ওর আর ফিরে যাবার উপায় নেই। যাবে কি করে? চারদিকে তো অথৈ সমুদ্র।'

'এই যুক্তির ওপর আর কোন কথা চলে না। কাজেই মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তা ঠিক।'

রানার টিটকারিতে এক সেকেণ্ডের জন্যে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল শিকদারের, পরমুহূর্তে স্বাভাবিক হয়ে গেল আবার। টকটকে লাল চোখে চাইল রানার চোখে। 'কাজেই গুলজারের সাথে ওর বিয়ে দিয়ে দিলাম।' রানার মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখে চট করে যোগ করল, 'না, না। তেমন কোন অত্যাচার হয় না ওর ওপর। সারা মাসের মধ্যে শুধু একটা রাত কাটাতে হয় ওকে গুলজারের ঘরে। বাকি উনত্রিশটা দিন রইল সেরে উঠে আবার মানসিক প্রস্তুতি নেবার জন্যে। আমার কাছে অবিচার পাবেন না।' শিউরে উঠল সোহানা। নিষ্প্রাণ হাসি হাসল শিকদার। 'মাঝে মাঝে গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যার প্রবণতা জাগে পূরবীর মধ্যে, তাই কোন রকম কাপড়-চোপড় পরতে দেয়া হয় না ওকে। অভিনেত্রী হলে কি হবে, হাজার হোক মেয়েমানুষ তো, খালি গায়ে বেড়াতে লজ্জা পায়, তাই মুখোশ বানিয়ে দিয়েছি একটা। এখন দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে সবার সামনে। এই থেকে প্রমাণ হয়, মেয়েমানুষের লজ্জা ওদের শরীরে নয়, চোখে। হঠাৎ প্রসঙ্গটা ত্যাগ করল শিকদার। আসুন, খেয়ে নেয়া যাক। কাজ পড়ে রয়েছে অনেক।'

প্রায় নিঃশব্দে খেয়ে উঠল ওরা। চমৎকার খাবার, অপূর্ব রান্না, কিন্তু নির্বিকার শিকদারের ভয়ঙ্করত্ব উপলব্ধি করতে পেরে সব বিস্বাদ লাগল রানার মুখে। কোন কিছু গোপন করবার প্রয়োজন বোধ করছে না সে রানার কাছে। সব জেনেও রানা যে কিছুই করতে পারবে না সে ব্যাপারে ওর আশ্চর্য এক স্থির অটল বিশ্বাস দেখে টলে গেছে রানা নিজেই। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী না হলে এত অটল আস্থা আসতে পারে না কারও নিজের ওপর। এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা একবার ভাবল রানা। বর্জন করল চিন্তাটা। পরে।

ডিনার শেষ হতেই একটা ট্রেতে করে কফি নিয়ে এল পূরবী।

সবার জন্যে কফি ঢালতে শুরু করল সোহানা। অসতর্ক মুহূর্তে বাঁ হাতের ধাক্কা লেগে পড়ে গেল একটা কাপ। চট করে ওটা ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল গোটা কয়েক চামচ।

'আই অ্যাম সরি,' বলল সোহানা। নিচু হয়ে তুলতে গেল ওগুলো কার্পেটের ওপর থেকে।

'না, না। আপনি বসুন, আমি তুলছি,' বলল রানা। চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিচু হলো সে-ও। সোহানার মাথার সাথে ঠোকাঠুকি লেগে গেল রানার মাথা। রানা বলল, 'সরি।'

কথা বলে উঠল শিকদার। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওগুলো তোলার দরকার নেই। নতুন কাপ-তস্তরি নিয়ে আসবে পূরবী।'

ততক্ষণে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিয়েছে সোহানা রানার হাতে। আলগোছে কাগজটা পকেটে ফেলল রানা। সোজা হয়ে বসল আবার। টকটকে লাল চোখে চেয়ে রয়েছে শিকদার রানার চোখের দিকে, ঠোঁটে অদ্ভুত এক টুকরো হাসি। চোখ সরিয়ে নিল রানা।

নতুন কাপ তস্তরী এল, কফি ঢেলে দিল পূরবী। খাওয়া শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল শিকদার।

'সোহানা, তোমার ঘরে যাও। ডক্টর রানা, আপনাকে আপনার ঘর চিনিয়ে দেবে পূরবী। প্রচুর বইপত্র আছে, ইচ্ছে করলে পড়তে পারেন। রাত ঠিক এগারোটায় ল্যাবরেটরি ছাড়া আর সব ঘরের বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়, কাজেই তার আগেই শুয়ে পড়বেন। কোন প্রয়োজন হলে কলিংবেল টিপতে দ্বিধা করবেন না—দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত থাকবে গুলজার আপনার খেদমতের জন্যে। অবশ্য আগামী কালকের রাতটা ওর ছুটি। একমাস পর পর একটি রাতের জন্যে ছুটি পায় বেচারা। যাই হোক, আজকের রাতটা বিশ্রাম নিন, কাল থেকে ঘুরে ফিরে দেখতে শুরু করবেন এলাকাটা। কি বলেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আপনি যা বলেন।'

'সেই ভাল।' হাসল শিকদার। 'আমার কথামত কাজ করাটা আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হবে। আমি চাই না ডক্টর আলমের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক।'

'ডক্টর আলম কে?' ভেজা বেড়ালের মত জিজ্ঞেস করল রানা।

'সবই জানতে পাবেন ধীরে ধীরে। চলি। কাজ আছে আমার। কাল দেখা হবে আবার। উইশ ইউ প্লেজ্যান্ট স্লীপ।'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল শিকদার। বেরিয়ে গেল ডান পাশের একটা দরজা দিয়ে। আগেই চলে গেছে সোহানা। রানা ফিরল পূরবীর দিকে। ভেনাসের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশে। এগিয়ে গেল রানা। ফর্সা কাঁধের উপর হাত রাখল।

'আমি দুঃখিত। যে পাশবিক নির্যাতনের কথা শুনলাম…'

চট করে কাঁধের ওপর থেকে রানার হাতটা সরিয়ে দিল পূরবী, মাথা ঝাঁকাল, তারপর চুপ করার ইঙ্গিত করল একটা আঙুল মুখের কাছে তুলে। আবছা একটা ছায়ার মত দেখতে পেল রানা দরজার বাইরে। কথাটা বন্ধ করে না দিয়ে চট করে মোড় ঘুরিয়ে ফেলল বক্তব্যের।

'…আমার দ্বারা সে ভয় আপনার নেই। সত্যিই, আসুন না রাতটুকু একসঙ্গে কাটানো যাক?'

হেসে ফেলল পূরবী। নিঃশব্দ হাসি। পেটটা কাঁপল বার কয়েক। সামলে নিয়ে পরিষ্কার কণ্ঠে বলল, 'না!'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ। আমার ঘরটা দেখিয়ে দিন তাহলে।'

'চলুন।' হাঁটতে শুরু করল পূরবী।

দরজা দিয়ে বেরিয়েই গুলজারকে দেখতে পেল রানা, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুকে হাত বেঁধে। রানা এগোতেই ওর পিছনে চলতে শুরু করল। সারি বেঁধে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল ওরা।

চমৎকার সাজানো গোছানো বেডরুম। রানার স্যুটকেস খুলে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে যেখানকার জিনিস সেখানে। জামা-কাপড় আলনায়, একজোড়া স্যুট,

জ্যাকেট আর গোটা দুই প্যান্ট হ্যাঙ্গারে আটকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে ওয়ারড্রোবের ভিতর। জুতো, স্যাণ্ডেল, যেটা যেখানে রাখা উচিত সেখানেই রাখা হয়েছে সযত্নে। চুলের ব্রাশ, ইলেক্ট্রিক শেভ, বিফোর অ্যাণ্ড আফটার শেভ লোশন সাজিয়ে রাখা হয়েছে ড্রেসিং টেবিলের ওপর অন্যান্য প্রসাধনীর পাশে। দুধ-সাদা চাদর বিছানো প্রকাণ্ড এক ডাবল-বেড খাট পাতা রয়েছে ঘরের ঠিক মাঝখানটায়। উত্তর-দক্ষিণে দুটো জানালায় এক ইঞ্চি মোটা রডের গ্রিল। দুর্ভেদ্য।

বেরিয়ে গেল পূরবী। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল দরজার ভারি পাল্লাটা। মৃদু অথচ স্পষ্ট একটা খুট শব্দ শুনতে পেল রানা বল্টু লাগানোর। এগিয়ে এল রানা। আস্তে করে টেনে দেখল, দরজা বন্ধ। এ ঘর থেকে বেরোবার কোন উপায় নেই। ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিল।

অর্থাৎ ভাবল রানা, অন্তত আজকের রাতটুকুর জন্যে বিশ্রাম পাওয়া গেল।

প্রথমেই সারাটা ঘর পরীক্ষা করল রানা, দেয়ালগুলো পরীক্ষা করে দেখল, মেঝে পরীক্ষা করল। এরকম প্রাচীন দুর্গে, শুনেছে সে, নানান ধরনের চোরা পথ থাকে, মেঝের নিচে গুহা থাকে, দেয়ালের গায়ে গোপন দরজা থাকে—কিন্তু সে ধরনের কিছুই খুঁজে পেল না সে। কোথাও কোন ফুটো আছে কিনা, বাইরে থেকে রানার ওপর নজর রাখা সম্ভব কিনা, সেটাও দেখল ভাল করে। যখন নিশ্চিন্ত হলো তখন চলে এল সে খাটের নিচে রাখা ওর স্যুটকেসটার কাছে। ডালা খুলেই ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল রানার।

অনেক যত্নে তৈরি করেছে স্যুটকেসটা বিসিআই এক্সপার্ট। একপাশে আড়াই বাই তিন বাই আঠারো ইঞ্চি ফল্স রাখা হয়েছে অতি কৌশলে। কারও বোঝার উপায় নেই। এই কম্পার্টমেন্টের মধ্যে সযত্নে তুলো মুড়ে সাজিয়ে দেয়া হয়েছিল একটা এক্সট্রা ম্যাগাজিন সহ রানার প্রিয় ওয়ালথার পি. পি. কে. আর একটা শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটার। কিছু তুলো পড়ে আছে, আর রয়েছে স্পেয়ার ম্যাগাজিনটা। পিস্তল আর ট্র্যান্সমিটার নেই।

চট করে বুকে হাত দিল রানা। আছে। গেঞ্জির সঙ্গে আটকানো বলপয়েন্ট পেনটা আছে। এখন এটাই একমাত্র ভরসা। কিন্তু পিস্তল আর ট্র্যান্সমিটার দেখে কি ধারণা করবে শিকদার ওর সম্পর্কে? বুঝে ফেলবে যে ও আসলে এসেছে সোহানাকে উদ্ধার করতে? সরাসরি প্রশ্ন করলে কি ব্যাখ্যা দেবে সে পিস্তল আর ট্র্যান্সমিটারের?

প্যান্টের এক ছোট্ট গোপন পকেটে স্পেয়ার ম্যাগাজিনটা ঢুকিয়ে দিয়ে বাক্সের ডালা নামিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। যা হবার হবে, বেশি ভেবে লাভ নেই। জামা-কাপড় ছেড়ে অ্যাটাচড় বাথরুমে ঢুকল রানা টাওয়েলটা কাঁধে ফেলে। দশমিনিট ভিজল শাওয়ারের ঝিরঝিরে পানিতে। হয়তো আশা করেছিল ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে সব দুশ্চিন্তা, কিন্তু গেল না। উদ্যত সাপের ফণার মত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সে কয়েকটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন—কি করবে সে এখন? কি করে খবর দেবে ঢাকায়? কিভাবে পালাবে এখান থেকে? কিভাবে বাঁচাবে সোহানাকে?

পকেটে হাত দিল সিগারেটের প্যাকেট বের করবার জন্যে। সোহানার লেখা

চিরকুটটা বাধল হাতে। অল্প কয়েকটি কথা:

তুমি আসবে, আমি জানতাম। কিন্তু বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। একা তুমি কিছু করতে পারবে না, রানা। লোকটা ডেভিল ওয়ার্শিপার। পরশু রাতে বলি দেয়া হবে আমাকে। তোমারও নিস্তার নেই এর হাত থেকে। যদি পারো, কালই পালিয়ে যাও দ্বীপ ছেড়ে। সম্ভব হলে ঢাকা থেকে লোক নিয়ে ফিরে এসো। অমাবস্যার আগে। এ ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। সময় বেশি নেই, রানা। খুব ভয় লাগছে।

চিঠিটা বার দুয়েক পড়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। ঠিকই বলেছে সোহানা। শিকদারের ক্ষমতার তুলনায় কিছুই নয় সে। কিন্তু একটা কথা ঠিকমত জানে না সোহানা এখনও—প্রতিপক্ষের ভয়ে, তা সে যত বড়ই হোক, পালিয়ে যাবার পাত্র মাসুদ রানা নয়। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন কাজ, কিন্তু এই কঠিন কাজটা করবার জন্যে আসেনি এখানে, এর চেয়েও কঠিন কাজ করতে হবে ওকে। যদি যায়, সোহানাকে নিয়েই যাবে সে, একা নয়। চোয়াল দুটো একটু শক্ত হলো রানার—দেখা যাক কত বড় শক্তি ধরে শিকদার।

চিরকুটটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলল রানা, কমোডে ফেলে টেনে দিল চেন। ইজিচেয়ারটা জানালার ধারে টেনে নিয়ে বসল। সিগারেট ধরাল একটা।

সিগারেট পুড়ছে একটার পর একটা। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে রানা। এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সমস্ত কিছু মনের মধ্যে গুছিয়ে নিল প্রথমে, তারপর একটার পর একটা পরিকল্পনা আসতে শুরু করল ওর উর্বর মস্তিষ্কে। শিকদারের কোন্ দুর্বলতার সুযোগ কিভাবে নেয়া যায় তার খসড়া তৈরি করল সে মনে মনে একটার পর একটা, এবং এক এক করে বাতিল করল সব ক'টাকেই। শেষে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল এক ঘণ্টা পর। তার চেয়ে কিছু বইপত্র ঘাঁটলে কাজে দিতে পারে।

শেলফ ভর্তি অসংখ্য বই। বিসমিল্লাহ বলে হাত বাড়াল রানা, যেটা হাতে ঠেকল সেটাই বের করে নিয়ে এল বিছানায়। শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। ওরে সব্বোনাশ! সোহেল যে কটা বই পাঠিয়েছিল সেগুলো তাও কিছুদূর এগোনো গিয়েছিল, এটা একেবারে ঝুনো নারকেল। তবু হাল ছাড়ল না রানা, উল্টে চলল পাতার পর পাতা। শেষ পাতা থেকে শুরু করল, এগিয়ে চলল প্রথম পাতার দিকে। মাঝ পথে আসতেই ওকে বায়োলজির পণ্ডিতের হাত থেকে উদ্ধার করল শিকদার—দপ করে নিভে গেল লাইট।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ ফাটানো একটা চিৎকার শুনে কেঁপে উঠল রানার অন্তরাত্মা। এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে বিছানা ছেড়ে। থেমে গেল ডাকটা। ছুটে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল রানা। আবার ডাক ছাড়ল কুকুরটা। কান্নার মত টানা, লম্বা, ভয়ঙ্কর ডাক। মনে হচ্ছে রানার বুকের মধ্যে থেকে উঠছে ডাকটা।

দূরে সরে গেল।

মিশমিশে অন্ধকার। নিচের দিকে চেয়ে কিছুই দেখতে পেল না রানা। ফিরে এল বিছানায়। ঘুম আসছে না।

খামোকা শুয়ে আছে। এপাশ ওপাশ ফিরছে রানা। বাথরুম হয়ে এল একবার, একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করল অন্ধকার ঘরে। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত অস্থির লাগছে। আবার ফিরে এল বিছানায়।

চোখটা লেগে এসেছিল, এমনি সময়ে মৃদু একটা খড়খড় শব্দ হলো ঘরের ভিতর। ঝট করে দরজার দিকে ফিরল রানা। না। শব্দটা ওদিক থেকে নয়। খাটের নিচে। মোলায়েম একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল স্পীকারের মাধ্যমে।

'স্লী···প ! সাউণ্ড স্লী···প! ঘুমোও, মাসুদ রানা। ঘুমোনো দরকার। এখুনি চোখ ভেঙে ঘুম আসবে তোমার। চোখ ভেঙে ঘুম আসবে।'

শিকদার! হিপনোটাইজ করবার চেষ্টা করছে রানাকে। এই ভাবেই বশ করেছিল সে সোহানাকে, এই ভাবেই বশ করে রেখেছে এখানকার সবাইকে। আরও একটু স্পষ্ট হলো কণ্ঠস্বরটা।

'ঘুম! ঘুম! ঘু···ম! ঘুমোও, রানা, ঘুমোও। ঘুমের শান্তি নামছে তোমার শরীরে, ঝিরঝিরিয়ে। ঝিরঝিরিয়ে। আরেকটু আরাম করে শোও। রিল্যাক্স। সমস্ত দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যাচ্ছে তোমার মন থেকে। যাক। ওসব মিছে ভাবনা। কোন কিছুরই কোন গুরুত্ব নেই, যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না, এরকম একটা ভাব আসবে এখুনি তোমার মধ্যে। সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে যাচ্ছে তোমার মাথা থেকে, সবকিছুই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে তোমার কাছে, সব মূল্যহীন, সব অর্থহীন। আরামে বুজে আসছে তোমার চোখ। আ···হ্! আরা···ম! বুক ভরে শ্বাস নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল দেখি!'

নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। এবং চমকে উঠল। নিজের অজান্তেই শিকদারের সম্মোহনী প্রভাবে চলে যাচ্ছিল সে। সচকিত হয়ে মনে মনে উচ্চারণ করল সে—না! মুহূর্তে কেটে গেল ঘোরটা।

নরম, মিষ্টি, একঘেয়ে কণ্ঠে কথা বলে চলেছে শিকদার।

'গুড! এবার আর একবার।···হ্যাঁ। এই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই দূর হয়ে গেল তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তা। সেইসঙ্গে ঢিল হয়ে আসছে তোমার শরীরের সমস্ত আড়ষ্ট পেশী। আরামে চোখ দুটো বুজে গেছে তোমার। আরা···ম! গভীর ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছ তুমি। আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলো, ভাল লাগবে।···বেশ! অদ্ভুত একটা স্বপ্নিল আমেজে ডুবে যাচ্ছ তুমি। কোন কিছুতেই আর কিছু এসে যায় না তোমার। ঘুম, ঘুম, আরা···ম!'

পাঁচ সেকেণ্ড চুপচাপ। তারপর আবার শুরু হলো, 'হাত-পাগুলো ভারি হয়ে এসেছে তোমার। আরও ঢিল দিতে হবে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটা পেশী, প্রতিটা স্নায়ু ঢিল দিতে হবে। প্রথমে পা থেকে শুরু করো। বাঁ পায়ের সমস্ত পেশী শক্ত করে ফেল।···আরও। এইবার হঠাৎ ঢিল করে দাও। পায়ের পাতা থেকে কোমর পর্যন্ত বাঁ দিকটা আলগা হয়ে গেল, ঢিল হয়ে গেল।···মনে হচ্ছে ওই অংশটা

ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার ডান পা। পায়ের পাতা থেকে কোমর পর্যন্ত শক্ত, টান করে ফেল। ...হ্যাঁ। এইবার ঢিল দাও।...ঘুমিয়ে পড়ল ডান পা-টাও। শরীরের নিচের অংশটা ভারি হয়ে গেছে। রিল্যাক্সড্। ...গুড। এবার পেটের কাছে পেশীগুলোকে ঢিল করে দাও...ঠিক আছে। আরেকটু। এবার বুকের পেশীগুলো। আবার একবার বুক ভরে শ্বাস নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল দেখি!...হ্যাঁ, হয়েছে। এবার পিঠের সমস্ত পেশী ঢিল হয়ে যাক। কাঁধ আর ঘাড়ে একটু আড়ষ্টতা রয়ে গেছে, ঢিল দাও, ঢিল করে দাও। হাত দুটো ঢিল দাও এবার। আ...হ্! আরা...ম! সারা মুখে অসংখ্য ছোট ছোট পেশী আছে, সেগুলো ঢিল দাও এবার। গাল, চোয়াল, চোখ, কপাল, সব ঢিল হয়ে গেল। পরিপূর্ণ বিশ্রাম। আ...হ্! সারা শরীরে নামছে ঘুমের শান্তি। ঝিরঝির, ঝিরঝির, নামছে ঘুমের শান্তি। ঘুম! ঘুম! ঘু...ম! ভাল লাগছে তোমার এই সম্মোহিত অবস্থাটা। কিছুতেই কিছু এসে যায় না। ক্রমেই আরও, আরও, আরও গভীরে চলে যাচ্ছ তুমি।...আরও গভীরে। আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছ তুমি শুধু, আর কোন কিছুর কোন অস্তিত্ব নেই। আমার ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করেছ তোমার অবচেতন মন, আমার ইচ্ছেমত চলবে তুমি এখন থেকে, আর কোন কিছুর মূল্য নেই। তুমি এখন সম্পূর্ণভাবে আমার ইচ্ছের বশ। ভবিষ্যতে যে-কোন দিন যে-কোন সময় আমি "এক হাজার পাঁচ"—কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মোহিত হয়ে পড়বে তুমি, এবং আমার আদেশ পালন করবে বিনা দ্বিধায়।'

পাঁচ সেকেণ্ড চুপচাপ। তারপর আবার ভেসে এল শিকদারের কণ্ঠস্বর।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আসছি তোমার ঘরে। কিছু প্রশ্ন আছে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সত্য উত্তর চাই আমি তোমার কাছ থেকে। কোন কিছু গোপন না করে সঠিক উত্তর দেবে। আর এই পাঁচ মিনিটে সম্মোহনের সমনামবুলিস্টিক স্তরে, অর্থাৎ গভীরতম স্তরে চলে যাবে তুমি। অপেক্ষা করো, আসছি আমি।'

ঠিক পাঁচ মিনিট পর ধীরে ধীরে খুলে গেল ওয়ারড্রোবের ডালাটা। বাঁ হাতে একটা জলন্ত মোমবাতি, আর ডান হাতে একটা চকচকে ক্ষুরধার ছুরি নিয়ে ওয়ারড্রোবের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ডক্টর শিকদার। সারা শরীর কালো একটা আলখেল্লায় ঢাকা, মাথায় অদ্ভুত ধরনের একটা টুপি। শিকদারের পিছু পিছু ঘরে ঢুকল গুলজার। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওরা বিছানার পাশে।

'এক...হাজার...পাঁচ! শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?...শুনতে পেলে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা উঁচু করো।'

বাঁ হাতের কড়ে আঙুল উঁচু করল রানা।

'বেশ। এবার সম্মোহিত অবস্থায় ধীরে ধীরে উঠে বসো বিছানায়।'

ধীরে ধীরে উঠে বসল রানা। চোখ বন্ধ।

'আমার দিকে ফেরো এবার। চোখ মেলে চাও। মোহতন্দ্রা টুটবে না চোখ মেলে চাইলেও। গভীর ভাবে সম্মোহিত রয়েছ তুমি এখন, আরও গভীরে চলে যাবে তুমি আমার চোখের দিকে চাইলেই। চোখ মেলো।'

ধীরে ধীরে খুলে গেল রানার চোখের পাতা। অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে শিকদারের টকটকে লাল চোখের দিকে। পলক পড়ছে না দু'জনের কারও

চোখের।

পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল শিকদারের মুখে। ছুরিটা ধরল উঁচু করে ন্যায়দণ্ড ধরার মত।

'তোমার নাম কি?'

জড়ানো কণ্ঠে উত্তর বেরোল রানার মুখ থেকে, 'মাসুদ রানা।'

'এখানে এসেছ কেন?'

'চাকরি।'

'তোমার স্যুটকেসের মধ্যে এসব কেন? গুলজারের হাতের দিকে চেয়ে দেখো।'

গুলজারের হাতে ধরা পিস্তল আর ট্র্যান্সমিটারের দিকে চাইল রানা। দৃষ্টিটা আবার ফিরে এল শিকদারের চোখে। মুখে কোন উত্তর নেই।

'উত্তর দাও।'

চুপ করে রইল রানা।

গর্জন করে উঠল শিকদার, 'উত্তর দাও, মাসুদ রানা! ওগুলো তোমার?'

'না।'

থমকে গেল শিকদার কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। তারপর বলল, 'ওগুলো কি?'

'রেডিয়ো, আর পিস্তল।'

ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল শিকদারের। 'ওগুলো যাই হোক আর যারই হোক, তোমার স্যুটকেসে কেন?'

রানা নিরুত্তর।

'জবাব দাও।'

তোতলাতে শুরু করল রানা, 'আমি, আমার···না, স্যুটকেস···ওটা···আমি···' কণ্ঠস্বর ওপরে উঠছে।

'ঠিক আছে, আবার প্রশ্ন করছি আমি। ওগুলো তোমার যদি না হয়, তোমার কাছে এল কি করে?'

'ভুল করে।'

'স্যুটকেসটা তোমার না? এই জামাকাপড় তোমার না?'

'না।'

'তোমার কাছে এল কি করে?'

'ভুল করে।'

'প্লেনে বদল হয়ে গেছে কারও সঙ্গে?'

'হ্যাঁ!'

'কার সঙ্গে?'

'আমেরিকান জার্নালিস্ট।'

'কখন টের পেলে?'

'এই ঘরে ঢুকে।'

হাসি ফুটে উঠল শিকদারের মুখে।

'পিস্তল বা ওয়ারলেস ট্র্যান্সমিটার জীবনে ব্যবহার করেছ কখনও? কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানো?'

'না।'

'তোমার কাছে কোন রকম অস্ত্র আছে?'

'না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল শিকদার। বালিশের পাশ থেকে বায়োকেমিস্ট্রির খোলা বইটা তুলে নিল হাতে। উল্টেপাল্টে দেখে রেখে দিল আবার বালিশের পাশে। ফিরল রানার দিকে।

'ঠিক আছে। আমি সন্তুষ্ট। এবার একটা প্রশ্ন—পূরবীকে তোমার সঙ্গে রাত কাটাবার প্রস্তাব দিয়েছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'সোহানা চৌধুরীর প্রতি ওই রকম আকর্ষণ বোধ করেছ?'

'করেছি।'

'এটা স্বাভাবিক। মনে মনে যত খুশি দুর্বলতা বোধ করো, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সাবধান, সোহানা চৌধুরীকে কক্ষনও এ ধরনের কোন প্রস্তাব দেবে না। প্রস্তাবটা ওর তরফ থেকে যদি আসে, প্রত্যাখ্যান করবে। ওর শরীরের প্রতি কোনরকম লোভ বা আসক্তি জাগবে না তোমার মধ্যে। কোন রকম কুচিন্তা আসবে না তোমার মনে। ওকে বলি দেব আমি এই অমাবস্যায়। কুমারী যুবতী নারী দরকার আমার। খবরদার, ওর গায়ে হাত দেবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি বুঝতে পেরেছ?'

'সোহানা চৌধুরীর গায়ে হাত দেব না।'

'হ্যাঁ। যদি ভুলে কখনও ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়, তীব্র একটা বৈদ্যুতিক শক লাগবে তোমার হাতে।' পৈশাচিক হাসি শিকদারের মুখে। পিছিয়ে গেল এক পা। ছুরির ডগাটা ধরল রানার কপালে।

'এবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়বে তুমি। ঘুম থেকে উঠে সম্মোহনের কথা কিছুই মনে থাকবে না তোমার। আমরা কিভাবে এ ঘরে ঢুকলাম, কিভাবে বেরিয়ে গেলাম, কিছুই মনে থাকবে না। কিন্তু আমার প্রতিটা আদেশ পালন করবে তুমি অক্ষরে অক্ষরে। এক হাজার পাঁচ বলার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মোহিত হয়ে যাবে তুমি, সোহানা চৌধুরীকে স্পর্শ করলেই ইলেকট্রিক শক খাবে, এ ঘর থেকে বেরোবার গুপ্ত পথ খুঁজে পাবে না কিছুতেই। এবার শুয়ে পড়ো।' রানার কপাল থেকে ছুরি সরিয়ে নিল শিকদার।

শুয়ে পড়ল রানা।

'চোখ বন্ধ করো। ...গুড। ঘুমাও, মাসুদ রানা। দশ মিনিটের মধ্যে তোমার এই মোহ-তন্দ্রা স্বাভাবিক ঘুমে রূপান্তরিত হবে। আ...হ্! আরা...ম! গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ছ তুমি। ঘুমাও। ঘু...মা...ও।'

বেরিয়ে গেল শিকদার। পিছু পিছু গুলজার। বন্ধ হয়ে গেল ওয়ারড্রোবের

ভালা।

নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

মুখে স্মিত হাসি।

ছয়

বাথরুম থেকে বেরিয়েই শুনতে পেল রানা—ঠক, ঠক, ঠক। দরজায় টোকা।

দ্রুতহাতে জামাকাপড় পরে নিল সে। দেরি হয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠতে। মড়ার মত ঘুমিয়েছে সারা রাত। ভোর পৌনে চারটার দিকে ঘুম ভেঙেছিল একবার, ডেকে উঠেছিল সেই ভয়ঙ্কর কুকুরটা, জানালায় দাঁড়িয়ে কিছুই দেখতে পায়নি সে নিচে অন্ধকারে। হঠাৎ চোখ পড়েছিল দুর্গের অবজারভেশন টাওয়ারের দিকে। দেখেছিল, উঁচু টাওয়ার থেকে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে মোমবাতি হাতে নেমে আসছে শিকদার। কালো আলখেল্লায় একটা প্রকাণ্ড বাদুড় মনে হচ্ছিল ওকে। বিছানায় ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে সে আবার, ঘুম ভাঙতে ভাঙতে একেবারে আটটা।

আবার টোকা পড়ল দরজায়। ছিটকিনি খুলে দিল রানা।

দাঁড়িয়ে আছে পূরবী। মুখে মুখোশ।

'আসুন, ভিতরে আসুন,' ডাকল রানা।

একটু ইতস্তত করে ঘরে ঢুকল পূরবী। একটু জোরে বলল, 'নাস্তা রেডি।' আরও দু'পা এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'সোহানাকে খুন করা হচ্ছে কাল রাতে।'

'জানি আমি,' বলল রানা খাটো গলায়।

'কি করে ঠেকাচ্ছেন সেটা?'

'ঠেকাতে যাব কেন? আমার কি? আমি রিসার্চ স্কলার, এসেছি···'

'ওর জন্যে এসেছেন।' বাধা দিয়ে বলল পূরবী ওর অদ্ভুত উচ্চারণে। মনে হয় কথা বলবার সময় ঠোঁট নড়াচ্ছে না। 'জানি। ওকে চোখ ঠারতে দেখেছি, আপনার হাতে চিঠি গুঁজে দিতে দেখেছি কাল।'

একটু যেন থমকে গেল রানা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল পূরবীর মুখোশের দিকে। তারপর হাসল। মুহূর্তে বুঝে নিয়েছে রানা, এসব দেখা সত্ত্বেও যখন ব্যাপারটা শিকদারের অজানা রয়েছে, তখন বিশ্বাস করা যায় একে। গত রাতে ওকে কি প্রস্তাব দিয়েছিল, সেটা শিকদারের কানে গেছে খুব সম্ভব অন্য কোন ভাবে। বলল, 'শুধু ওর জন্যে কেন, আপনার জন্যেও এসেছি।'

চুপ করে রইল পূরবী। কোন রকম ভাবান্তর না দেখে একটু অবাক হলো রানা। বলল, 'চান না মুক্ত হতে?'

'না।'

'কেন?'

'যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। কিন্তু যে করে হোক ওকে রক্ষা করুন। সাহায্য দরকার হলে···'

'নিশ্চয়ই। আপনার সাহায্য অনেক উপকারে আসবে। কিচ্ছু ভাববেন না। মুক্ত আমরা হবই। অন্তত চেষ্টার ত্রুটি করব না। বুঝতে পারছি, আপনি খুবই ভেঙে পড়েছেন, কিন্তু...' কথা বলতে বলতে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে পূরবীর কাঁধে হাত রাখতে যাচ্ছিল রানা, ঝট করে সরিয়ে নিল একটা ছায়া দেখে।

দরজায় এসে দাঁড়াল গুলজার। পূরবীকে দেখে হাসি ফুটে উঠল দানবটার বীভৎস মুখে। বোধহয় খুঁজছিল ওকেই। সারা শরীরে দৃষ্টি বোলাল। লোভে চকচক করছে চোখ দুটো।

'নাস্তা রেডি,' কথাটা আবার একবার বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পূরবী। পিছু পিছু চলল রানা। তার পেছনে গুলজার।

দরজার দিকে মুখ করে ঠিক একই ভঙ্গিতে বসে আছে সোহানা। একা। রানা গিয়ে বসল পাশের চেয়ারে। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল পূরবী। গুলজারও।

সামনের দিকে ঝুঁকে এল সোহানা। চাপা গলায় বলল, 'কিভাবে পালাচ্ছ?'

'ঠিক করিনি এখনও। আগে চারপাশটা ঘুরে ফিরে দেখে বুঝে নিতে হবে...'

'যাই হোক, আজই পালিয়ে যাচ্ছ তো?'

'চেষ্টা করব। কিন্তু সহজ হবে না কাজটা।'

'অমাবস্যার আগে ফিরে আসতে পারবে না?' অদ্ভুত এক মিনতি ফুটে উঠল সোহানার চোখে।

মাথা নাড়ল রানা। 'একবার পালাতে পারলে আর আসছি না এই পিশাচ দ্বীপে। অমাবস্যার আগেও না পরেও না।' সোহানাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে হাসল রানা, নেড়ে দিল ওর থুতনিটা। 'একা যাচ্ছি না।'

আঁতকে উঠল সোহানা। 'কিন্তু সে কি করে সম্ভব? এতসব বাধা ডিঙিয়ে তোমার পক্ষে একা পালানোই দুঃসাধ্য, আমাকে সঙ্গে নিলে তো দু'জনই...'

'মরলে একসঙ্গে মরব, সোহানা, বাঁচলে বাঁচব একসঙ্গে। কি ভেবেছ তুমি আমাকে? তোমাকে ফেলে পালিয়ে যাব? তোমাকে এই বিপদের মধ্যে ফেলে নিজের প্রাণ বাঁচাব? অসম্ভব...' আড়চোখে দেখতে পেল রানা, ঘরে ঢুকছে ডক্টর শিকদার। কথাটা শেষ করল অন্যভাবে। '...মিস সোহানা। আপনাকে আমি আমার আপন বোনের মত দেখি। অন্য কোন দৃষ্টিতে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দয়া করে মাফ করুন। আপনাকে পছন্দ করি আমি, কিন্তু তাই বলে...' ঘাড় ফিরিয়ে শিকদারকে দেখল রানা, এবং থেমে গেল।

জুতোর মচমচ শব্দ তুলে বিহ্বল সোহানার পাশে এসে দাঁড়াল শিকদার। টিটকারির হাসি ওর ঠোঁটে।

'কি? প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছিল বুঝি?' রানার দিকে চেয়ে বলল, 'না, না। বসুন, বসুন। উঠতে হবে না। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। তাছাড়া আপনি হয়তো ভেবেছেন আমি আপনার সেই প্রফেসার অ্যালানের মত হোমরাচোমরা কোন স্কলার। আসলে তা নয়। আমি সাধারণ একজন এম.বি.বি.এস. ডাক্তার। নিন, শুরু করা যাক।'

মচমচে পাউরুটির ওপর পুরু করে মাখন লাগাল রানা। তার ওপর স্লাইস

করে কাটা টিনের নোনতা পনির বিছিয়ে কামড় দিল।

'যা বলছিলাম,' আগের কথার খেই ধরল শিকদার মিনিট তিনেক নিঃশব্দে খেয়ে। 'আপনাকে কেন এখানে আনা হয়েছে, কি নিয়ে রিসার্চ করতে হবে, এই দ্বীপে আপনার পজিশনটা ঠিক কি, এসব ব্যাপারগুলো আগেভাগেই আপনাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই বেশ কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছে আপনার মনে, কিছু অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছেন, সে সবের উত্তরও আপনার জানা দরকার। জানা দরকার, একজ্যাক্টলি হোয়্যার ইউ স্ট্যাণ্ড। কি বলেন? রাখ-ঢাকের আর কোন দরকার নেই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বাটার টোস্টের ওপর একটা ডিম পোচ তুলছে সে ছুরি-কাঁটার সাহায্যে।

'আমি অসুন্দরের পূজারী। এক কথায় "স্যাটানিস্ট"।' বলল শিকদার সহজ কণ্ঠে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুরু করল ব্যাখ্যা, 'ক্ষমতার তৃষ্ণা মানুষের আদিমতম তৃষ্ণা। ঈশ্বর বা সুন্দরের কাছ থেকে এই ক্ষমতা কিছুতেই পাবেন না আপনি। সবাইকে সব কিছু দেয়ার ক্ষমতা ঈশ্বরের নেই। চেয়ে দেখেছি, পাইনি। তাই এরকম ঈশ্বরকে মানি না আমি। হাত পেতেছি শয়তানের কাছে। কুৎসিত আর কদাকারের একচ্ছত্র অধিপতি শয়তানের পায়ে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছি নিজেকে। ফলে সবকিছু ঢেলে দিয়েছে সে আমাকে। ক্ষমতা, জ্ঞান, প্রতিষ্ঠা, আধিপত্য, অর্থ, সব আসছে একে একে আমার হাতের মুঠোয়। যখন যা চাইছি, তাই পাচ্ছি আমি তার কাছ থেকে। অঢেল।' কটমট করে চাইল শিকদার রানার দিকে।

'লক্ষ করেছেন হয়তো, কোনকিছুই গোপন করবার চেষ্টা নেই আমার মধ্যে। কিছুই গোপন রাখছি না আমি আপনার কাছে। তার কারণ কি? গোপন করবার বা আড়াল করবার প্রয়োজন পড়ে না আমার। অন্তত এখানে নয়। আমার রাজত্বে আমি সর্বময় অধিকর্তা। এখানকার সব কিছু চলে আমার ইচ্ছা অনুযায়ী, কারও ক্ষমতা নেই আমার বিরোধিতা করে। আপনারও নেই। তাই রাখা-ঢাকার বালাই রাখিনি কোন। উলফাত একজন নামজাদা অভিনেতা ছিল, ধরে নিয়ে এসেছি আমি এখানে। গুলজার ছিল মিস্টার ঈস্ট পাকিস্তান, ধরে নিয়ে এসেছি আমি আমার দুর্গ পাহারা দেবার জন্যে। আরও প্রকাণ্ড, আরও শক্তিশালী করে তুলেছি ওকে কয়েকটা ছোটখাটো অস্ত্রোপচার করে। কিন্তু এর ফলে মাথা থেকে সব চুল ঝরে যাওয়া ছাড়াও ভয়ঙ্কর এক সিমটম দেখা দিয়েছে—বেশিদিন সেক্স স্টার্ভেশন হলে মাথা খারাপ হয়ে যায় ওর; তাই ধরে এনেছি পূরবী মুখোপাধ্যায়কে। ওর সৌন্দর্য সহ্য করতে না পেরে ঢেকে দিয়েছি ওর মুখটা মুখোশ দিয়ে। এই সোহানা চৌধুরীকে ধরে নিয়ে এসেছি ঢাকা থেকে। আগামীকাল বলি দেব ওকে লুসিফারের উদ্দেশে। কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে।'

রানা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কিনা, এসব শুনে রানার প্রতিক্রিয়া কি হয়, চুপচাপ কিছুক্ষণ লক্ষ করল শিকদার। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে রানার। অবাক চোখে শিকদারের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে সে। একটা ঢোক গিলে বলল, 'আ-আমাকে

কেন এনেছেন? মানে...'

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ডক্টর মাসুদ রানা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আদেশ পালন করছেন, ততক্ষণ কোন ভয় নেই। আপনাকে এনেছি ডক্টর আলমের রিসার্চের পরিপূরক হিসেবে কাজ করাবার জন্যে। অদ্ভুত ধরনের কিছু উদ্ভিদ তৈরি করেছি আমরা দু'জন মিলে। সচল উদ্ভিদ। আপনাকে তার মধ্যে জীবজন্তুর সচেতনতা, এমন কি সম্ভব হলে মানুষের বুদ্ধি ও র‍্যাশনালিটি এনে দিতে হবে। খেয়ে নিন। আধঘণ্টা মত সময় আছে আমার হাতে। নাস্তার পর ঘুরিয়ে দেখাব আমার ল্যাব।'

খাওয়ায় মন দিল রানা। তিনজনের জন্যে চা ঢালল সোহানা।

চায়ের কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে আবার শুরু করল শিকদার।

'একটা কথা প্রথম থেকেই পরিষ্কার ভাবে বুঝে নেয়া দরকার আপনার—এই দ্বীপে এসেছেন আপনি চিরতরে। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার আর কোন উপায় নেই। এই অবস্থাটা স্বীকার করে নিতে হবে আপনাকে। যেখানে খুশি যান, যা খুশি করুন আমার আপত্তি নেই; কিন্তু এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলেই ধরা পড়ে যাবেন। এবং তারপর আর খুব একটা সুনজরে দেখব না আমি আপনাকে। আমার শাস্তি বড় নির্মম, বড় ভয়ঙ্কর।'

চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল শিকদার। রানা আর সোহানাও উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ দু'জনের দিকে এক নজর চেয়েই থমকে গেল শিকদারের দৃষ্টি। পিছিয়ে গেল এক পা।

'বড় অদ্ভুত মানিয়েছে তো আপনাদের!' একবার রানা, একবার সোহানার মুখের দিকে চাইল সে বার কয়েক। তারপর আবার বলল, 'আশ্চর্য! ঠিক মনে হচ্ছে একজোড়া পায়রা। দারুণ ম্যাচ হত আপনাদের দু'জনের বিয়ে হলে। শুধু চেহারাই নয়, সূক্ষ্ম একটা আত্মিক যোগও দেখতে পাচ্ছি আপনাদের মধ্যে। কিন্তু না, যা হবার নয় তাই নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তবু, আর একটু বাঁয়ে সরে যান দেখি, ডক্টর রানা,...হ্যাঁ, ওয়াণ্ডারফুল লাগছে; সোহানার কাঁধে একটা হাত রাখুন দেখি?'

বাঁ হাতটা তুলে সোহানার কাঁধে রাখল রানা, কিন্তু পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ছিটকে সরে গেল। অস্ফুট একটা কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল শিকদার।

'কি জানি!' বোকার মত এদিক ওদিক চাইল রানা। 'মনে হলো ভয়ঙ্কর একটা ইলেকট্রিক শক খেলাম।'

হো হো করে হেসে উঠল শিকদার। বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও কিছু না। চলুন এগোনো যাক।' পা বাড়াল শিকদার। সোহানাকে থেমে থাকতে দেখে বলল, 'এসো, তুমিও দেখে নাও আমার সত্যিকারের চেহারাটা।'

দু'পাশে বন্ধ বা খোলা দরজা, মাঝখান দিয়ে পথ। শুধু তিন জোড়া জুতো স্যাণ্ডেলের শব্দ, তাছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ। প্রকাণ্ড দুর্গের বেশির ভাগ ঘরেই জমে

আছে পুরু ধুলো, অব্যবহৃত। এগিয়ে চলল ওরা করিডর ধরে। বার পাঁচেক ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে একটা লম্বা করিডরের শেষ মাথায় এসে প্রকাণ্ড এক বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল ডক্টর শিকদার। অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে এক হাত তুলে মাথা ঝাঁকাল।

'এই হচ্ছে আমার চিড়িয়াখানা, যাদুঘর বা বোটানিক্যাল গার্ডেন—যাই বলুন। আসুন।'

দরজাটা খুলতেই কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ এল রানার নাকে। ঢুকে পড়ল শিকদারের পিছু পিছু।

প্রকাণ্ড একটা হলরুম, কয়েকটা সাত ফুট উঁচু পার্টিশন দিয়ে কয়েক ভাগে ভাগ করা। প্রথমেই একটা চিতা বাঘের ওপর চোখ গেল রানার। ডান ধারে একটা লোহার খাঁচা, তার ভিতর নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা চিতাবাঘ। রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে বাঘটার দিকে চাইল শিকদার, তারপর মৃদু হেসে এগিয়ে গেল খাঁচাটার দিকে।

'এটাকে চিতাবাঘ না বলে চিউণ্ড বলা উচিত,' বলল শিকদার হাসিমুখে। 'শরীরটা পুরোপুরি চিতার, কিন্তু এর মগজের প্রায় অর্ধেকটা হচ্ছে হাউণ্ডের মগজ। অপারেশনটা এমন ভাবে করেছি যেন চিতার শক্তি, হিংস্রতা ও দ্রুততা বজায় থাকে, আবার হাউণ্ডের প্রভুভক্তি আর ঘ্রাণশক্তিও বর্তায় এর ওপর। রাত এগারোটায় ছেড়ে দেয়া হয় এটাকে দুর্গ পাহারা দেয়ার জন্যে, ভোর রাতে আবার পুরে দেয়া হয় খাঁচায়। এর ডাক নিশ্চয়ই শুনেছেন কাল রাতে।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে ডেকে উঠল বাঘটা। বাঘের কণ্ঠে কুকুরের আওয়াজ। বিকট। শিউরে উঠল রানা এবং সোহানা একসঙ্গে। হো হো করে হেসে উঠল শিকদার।

'এ রকম অদ্ভুত জীব আরও একটা আছে আমার চিড়িয়াখানায়। চলুন, দেখাচ্ছি।'

এগোল শিকদার। রানা ভাবল এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা ওর ওপর। পালাবার পথে ঠিক কি কি বাধা আছে পরিষ্কার বুঝে নেয়ার আগে কি ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত হবে? অনায়াসে খুন করে ফেলতে পারে সে এখন শিকদারকে, কিন্তু খুন করা তো ওর আসল উদ্দেশ্য নয়, একে হত্যা করে ফেললেই কি সোহানা আর পূরবীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে সে এই দ্বীপ ছেড়ে? তাছাড়া এত নিশ্চিত কেন শিকদার? সে কি জানে না, তার যে-কোন বন্দী যে-কোন সময় হঠাৎ আক্রমণ করে বসতে পারে তাকে? আত্মরক্ষার কোন না কোন গোপন ব্যবস্থা আছে ওর। কি সেটা?

হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেল রানা গুলজারের মূর্তিটা। দশ হাতের মধ্যেই রয়েছে গুলজার। আলমারি, শেলফ আর পার্টিশনের আড়ালে আড়ালে অনুসরণ করে চলেছে ওদের। প্রভুর হুকুম পাওয়া মাত্র রানাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলতে দ্বিধা করবে না। মনে মনে হাসল রানা। যতখানি অকুতোভয়, সর্ব শক্তিমানের ভাব দেখাচ্ছে, ততটা নয়—শিকদারও ভয় পায় তাহলে!

দশ পা এগিয়ে বাঁ পাশে রাখা একটা খাঁচার দিকে চোখ পড়তেই থমকে

দাঁড়াল রানা। বানরের মত চার হাত-পায়ে পায়চারি করছে একটা লোক। সম্পূর্ণ নগ্ন। মুখটা দেখেই মনে মনে চমকে উঠল রানা।

ডক্টর আলম!

শিকদারকে দেখেই ভয়ার্ত এক বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল ডক্টর আলম। দু'হাতে লোহার শিক ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল মানুষের মত। মাথা নেড়ে বারণ করার ভঙ্গিতে আকুতি জানাচ্ছে শিকদারকে, ভয় পাচ্ছে নতুনতর নির্যাতনের। হঠাৎ সোহানার ওপর চোখ পড়তেই এক হাতে লজ্জা ঢাকল ডক্টর আলম। তারপর রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল করুণ চোখে। আকুল আবেদন ফুটে উঠল চোখের দৃষ্টিতে। রানা বুঝতে পারল কোন সাহায্যেই কোন কাজ হবে না আর। সমবেদনার দৃষ্টি চিনতে ভুল করল না জন্তুটা, হঠাৎ মুখটা হাঁ করে দেখাল, জিভ কেটে নেয়া হয়েছে ওর। টপ টপ জল ঝরছে গাল বেয়ে। সহ্য করতে না পেরে চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। হেসে উঠল শিকদার।

'এটাকে মানর বা বানুষ বলতে পারেন। এক সময় ইনি ছিলেন ডক্টর আলম। অনেক সাহায্য করেছেন ইনি আমাকে উদ্ভিদের ওপর আমার আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট গবেষণায়। কিন্তু বেঁকে বসলেন একদিন। আজ তাই এই অবস্থা। অবাধ্যতার শাস্তি। তাছাড়া আগেই ব্লটিং পেপারের মত শুষে নিয়েছিলাম ওর বিদ্যা, ওকে আর প্রয়োজন ছিল না আমার।' হাঁটতে শুরু করল শিকদার। 'চলুন, এবার বোটানিক্যাল গার্ডেনটা দেখা যাক।'

গার্ডেন না বলে এটাকে বোটানিক্যাল হেল বলা উচিত, ভাবল রানা। বিচিত্র অ্যাংগেল থেকে ফ্লাড লাইটের আলো ফেলা হয়েছে কোন কোন টবের ওপর, ঘরের বেশির ভাগটাই অন্ধকার। অদ্ভুত ধরনের ক্যাকটাস, বিকট-দর্শন একেকটা ফুল, বিষাক্ত আবহাওয়া। মনে হচ্ছে এসব এই পৃথিবীর গাছপালা নয়, অন্য কোন ভয়ঙ্কর জগতের জিনিস। এনসাইক্লোপিডিয়া বোটানিকায় যত রকম ভয়ঙ্কর উদ্ভিদের উল্লেখ আছে, সবই বোধহয় সংগ্রহ করেছে লোকটা। একটা টবে দোমড়ানো মোচড়ানো মানুষের হাতের মত দেখতে ছোট্ট একটা গাছ, ডালে একটা কার্ড বাঁধা রয়েছে: বিষ—অ্যাট্রোপা ম্যান্ড্রাগোরা। পাশের টবের একটা ফুলের ওপর থমকে দাঁড়াল রানার দৃষ্টি। ঠিক একটা মড়ার খুলির আকৃতি ফুলটার। গাছের গায়ে লটকানো কার্ডে লেখা: ডেথ প্ল্যান্ট।

কানের পাশে হেসে উঠল শিকদার। বলল, 'বুঝতে পেরেছেন? কুৎসিত আর কদাকার দিয়ে পৃথিবীটাকে ভরে ফেলব আমি। সৌন্দর্য দূর করে দেব এই গ্রহ থেকে। সেই সঙ্গে ঈশ্বর···'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সোহানা। ঝট করে পেছনে ফিরল রানা। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা গেল না, শুধু আবছা মত দেখা গেল, চার পাঁচটা বলিষ্ঠ হাত জড়িয়ে ধরেছে ওকে, প্রচণ্ড চাপে বাঁকা হয়ে গেছে সোহানার শরীর, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে শরীরটা ঘন অন্ধকারের দিকে।

এগোতে যাচ্ছিল রানা, কাঁধের ওপর হাত রাখল শিকদার। 'ব্যস্ত হবেন না। ওকে রক্ষা করার গরজ আপনার চেয়ে আমার অনেক বেশি।' হাত বাড়িয়ে একটা

সুইচ টিপল শিকদার। দপ করে জ্বলে উঠল একটা নীল বাতি।

পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, ধীরে ধীরে আলগা হয়ে গেল সবুজ বাহুগুলো। লতার মত নরম, কিন্তু মানুষের বাহুর সমান মোটা, অনেকটা অক্টোপাসের মত। তীব্র আলোয় কুঁকড়ে গেল একটু, মনে হলো থর থর করে কাঁপছে, তারপর সড় সড় করে ফিরে গেল হাতগুলো প্রকাণ্ড একটা টবে। আতঙ্কিত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সোহানা ওটার দিকে। শিউরে উঠল রানাও।

'এই আলোটা মোটেই সহ্য করতে পারে না বেচারা।' মমতা ঝরে পড়ল শিকদারের কণ্ঠে। 'এটাই ডক্টর আলমের শেষ আবিষ্কার। এরই মধ্যে সঞ্চার করতে হবে আপনাকে কনশাসনেস, ইন্টেলিজেন্স এবং সম্ভব হলে মানুষের র‍্যাশনালিটি। রাতের অন্ধকারে ছেড়ে দেব আমি এগুলোকে···' হঠাৎ থেমে গেল শিকদার, 'না, থাক। আমার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলে ডক্টর আলমের মত বেঁকে বসতে পারেন আপনিও। এখন শোনার দরকার নেই। চলুন এবার জাদুঘরটা দেখিয়ে দিই। হাতে সময় কম।'

শিকদারের পিছু পিছু বেরিয়ে এল ওরা বোটানিক্যাল হেল থেকে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। বিষাক্ত, নারকীয় গন্ধে দম আটকে আসবার উপক্রম হয়েছিল।

চলতে চলতে কথা বলে চলেছে শিকদার। 'একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাব এবার আপনাদের। জীবন্মৃত শব্দটা গল্প উপন্যাসে পড়েছেন আপনারা, কথায় কথায় বলেছেনও হয়তো বা, আজ স্বচক্ষে দেখতে পাবেন জীবন্মৃত অবস্থা কাকে বলে।'

একটা ছ'ফুট লম্বা, দেড় ফুট চওড়া কাচের জার সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। একটানে কাপড়টা সরিয়ে ফেলল শিকদার। ভিতরে চেয়েই আঁৎকে উঠল রানা। জারের ভিতর হালকা নীল তরল পদার্থ। তার মধ্যে শুয়ে আছে একটা বিকট দর্শন স্তন-কাটা স্ত্রীলোকের লাশ! সারা শরীরে অস্ত্রোপচারের ক্ষত। ভয়ঙ্কর ভাবে চেহারাটাকে বিকৃত করেছে কেউ উন্মাদের আক্রোশ নিয়ে। অনেক দিনের মড়া। বেশ খানিকটা চুপসে গিয়ে ভাঁজ পড়েছে সারা শরীরে, ঝুলে গেছে গায়ের চামড়া। ঘৃণায় রি রি করে উঠল রানার সর্বাঙ্গ।

হঠাৎ খেয়াল করল রানা, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে মহিলার। ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। শীতল স্রোত বয়ে গেল রানার মেরুদণ্ডের ভিতর। ভ্যাম্পায়ার! পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, ওপর সারির প্রথম চারটে বাদ দিয়ে দু'পাশের দুটো দাঁত অন্যগুলোর চেয়ে আধ ইঞ্চি বেশি লম্বা। নিচের ঠোঁট ছাড়িয়ে আরও খানিকটা নেমে এসেছে দাঁত দুটো। ড্রাকুলা ছায়াছবির কথা মনে পড়ল রানার। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে বীভৎস, মৃত মুখটার দিকে। দাঁতগুলো বাঁধানো নয়ত?

কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠল শিকদার। তারপর কটমট করে চাইল রানার দিকে।

'মেয়েটাকে ভালবাসতাম। আমার সঙ্গে পড়ত মেডিক্যাল কলেজে। দু'দুটো বছর হাবুডুবু খেয়েছি আমি ওর প্রেমে। কত মধুর কথা শুনিয়েছে ও আমাকে। আমি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছি। বিশ্বাস করেছি ওর প্রতিটি কথা। হঠাৎ একদিন আমাদের এক ব্যাচেলার অ্যাসোশিয়েট প্রফেসার-এর কোয়ার্টারে ঢুকে পড়েছিলাম।

জড়াজড়ি করে শুয়েছিল দু'জন। উলঙ্গ। হাসবার চেষ্টা করল শিকদার। কিন্তু কান্নার মত দেখাল হাসিটা। মনে হলো মুখ ভ্যাঙাচ্ছে। কচি মনে বড় দুঃখ পেয়েছিলাম সেদিন। এখন হাসি পায় সেসব কথা ভাবলে।'

জারের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে মড়াটার থুতনি নেড়ে দিল শিকদার।

'আহা! ঘুমিয়ে আছে আমার প্রেয়সী সুন্দরী! চমৎকার!' চোখ পাকিয়ে চাইল রানার দিকে। 'এটা কিন্তু মড়া নয়। অর্ধেক মড়া। পুরোপুরি মরতে দিইনি আমি ওকে। থিওরিটা বুঝিয়ে দিলে সহজেই বুঝতে পারবেন। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, মানুষ মরে যাওয়ার পরও কয়েকদিন পর্যন্ত তার নখ ও চুল বাড়ে? কেন এটা হয়? হয় এইজন্যে যে মৃত্যুর পরেও জীবনীশক্তি রয়ে যায় মৃতদেহে। এটাও নিশ্চয়ই জানেন, মৃত্যুর পরপরই মুক্তি পায় না আত্মাটা দেহের খাঁচা থেকে? খুব হালকা একটা কায়া অবলম্বন করে অ্যাস্ট্রাল প্লেনে চলে যায় আত্মাটা। স্থূল দেহটা রয়ে গেল পৃথিবীতে, ছায়ার মত একটা দেহ ধারণ করে আত্মা চলে গেল অ্যাস্ট্রাল প্লেনে। সেই দেহটার মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে জীবনীশক্তি রয়ে যায়। এই জীবনীশক্তি যতদিন না নিঃশেষ হবে, ততদিন পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে আরও উঁচু মার্গে চলে যেতে পারবে না আত্মা। আমরা জানি, অ্যাস্ট্রাল প্লেনের নাগরিকরা প্রবল এক আকর্ষণ বোধ করে এই মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসবার জন্যে। ঠিক এই সুযোগটাই নিয়েছি আমি। মেসোপটেমিয়ার ভ্যাম্পায়ারের কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই? আমি জীবনীশক্তি সাপ্লাই করে টেনে রেখে দিয়েছি একে এই পৃথিবীতেই। রক্ত দিতে হয়। প্রত্যেক শনিবার রাত এগারোটায় জেগে ওঠে ও। গুলজারের ঘাড়ে দাঁত ফুটিয়ে পোয়াটেক রক্ত শুষে নেয় ওর দেহ থেকে। এর ফলে ধীরে ধীরে ভ্যাম্পায়ার হয়ে উঠছে গুলজারও, দুটো দাঁত বাড়তে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। যাই হোক, কোনদিন মৃত্যু হবে না ভ্যাম্পায়ারের। পিশাচ হয়ে চিরদিন এই পৃথিবীর বুকে ঘুরবে আমার প্রেয়সী। জীবন্মৃত অবস্থায়। এই হচ্ছে আমার শাস্তির নমুনা।' মড়াটার মুখের দিকে চেয়ে ক্রূর হাসি হাসল শিকদার। 'না পারবে মরতে, না পারবে বাঁচতে; না যাবে স্বর্গে, না যাবে নরকে। মানুষের রক্ত খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াবে এই মাটির পৃথিবীতে। চিরদিন। এক অতৃপ্ত পিশাচিনী!'

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে প্রায় চমকে উঠল শিকদার। 'আমার এখুনি যেতে হচ্ছে। আপনারা ঘুরেফিরে দেখুন। অনেক কিছু আছে দেখবার। যেখানে খুশি যেতে পারেন, যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু সাবধান, ভুলেও কখনও দেয়ালের ওপাশে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। চলি।'

মচ মচ জুতোর শব্দ তুলে চলে গেল শিকদার।

শিউরে উঠল সোহানা। মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ।

'এসব কি সত্যি, রানা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'এই ভ্যাম্পায়ার...'

'দূর, সব বাজে কথা।' হালকা হওয়ার চেষ্টা করল রানা। 'মানুষকে খামোকা ভয় দেখিয়ে মজা পায় লোকটা। চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

'হ্যাঁ, চলো। এখানে আর এক দণ্ডও না।'

সাত

একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝে গেছে রানা, ভূত, প্রেত, ভ্যাম্পায়ার, এসব সত্যি কি মিথ্যে সে-নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন নয়। সোহানাকে যে বলি দেয়ার জন্যেই আনা হয়েছে তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যদি সে কোনভাবে ঠেকাতে না পারে, বলি হয়ে যাবে সোহানা। হাতে সময় মাত্র দু'দিন—না, একদিন। কাল সারাদিন দেখা পাওয়া যাবে না সোহানার। সকাল থেকে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে ওকে ঘিরে, চলবে প্রস্তুতিপর্ব, পালাবার আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। আজ। যে করে হোক পালাতে হবে আজই। সন্ধের আগেই।

কোথাও বাধা দিল না ওদের কেউ। সারাটা দুর্গ ঘুরে ঘুরে দেখল ওরা দু'জন। অবজারভেশন টাওয়ারটা দেখা হলো না শুধু। লোহার সিঁড়ি বেয়ে কিছুদূর উঠে দেখতে পেল, মাঝের দশ বারোটা ধাপ নেই। প্রায় দশ ফুট জায়গা ফাঁকা, তারপর আবার উঠে গেছে সিঁড়ি টাওয়ারের চুড়োয় বেশ বড়সড় একটা ঘরের দরজা পর্যন্ত। নিচে নেমে এল ওরা। বিস্মিত দৃষ্টিতে উপর দিকে চাইল একবার সোহানা।

'অথচ প্রত্যেক রাতে ওকে ওপরে উঠে যেতে দেখেছি আমি জানালা দিয়ে!'

হো হো করে হেসে উঠল দশ বারোজন লোক। চমকে পেছন ফিরল ওরা। হাসছে উলফাত।

'ঠিকই দেখেছেন,' বলল উলফাত কর্কশ কণ্ঠে। 'একটা কাঠের আলগা মই আছে। রাতে ফিট করা হয়, দিনে সরিয়ে রাখা হয়। ওপরে কি আছে দেখার সৌভাগ্য আমারও হয়নি কোনদিন। কিন্তু আপনার হবে।' সোহানার দিকে চেয়ে কুৎসিত ভঙ্গিতে চোখ টিপল উলফাত। 'কাল রাতে!' বিকট স্বরে হেসে উঠল আবার। হাসতেই থাকল রানারা চোখের আড়ালে সরে না যাওয়া পর্যন্ত। তারপর দ্রুত পায়ে চলে গেল অন্যদিকে।

ডক্টর শিকদারের অপারেশন থিয়েটারটা আধুনিকতম যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। ঠাণ্ডা। নিস্তব্ধ। ভয়ঙ্কর। পাওয়ার জেনারেটোরের ঘরটাও ঘুরে দেখল রানা। একটা মস্ত সুইচবোর্ডে অসংখ্য সুইচ, কোনটা কিসের ঠিক ঠাহর করা গেল না। চারপাশে চোখ বুলিয়ে এমন কোন যন্ত্র পেল না রানা যেটা ওর কাজে লাগতে পারে। ওখান থেকে বেরিয়ে দুর্গ-তোরণের দিকে হাঁটতে শুরু করল রানা। দুর্গের ভিতর আর দেখবার কিছুই নেই, বাইরে বেরিয়ে দেখতে হবে একবার।

'সন্ধের আগে কি করে সম্ভব?' হঠাৎ প্রশ্ন করল সোহানা। 'দেখে ফেলবে না?'

'দেখুক না সবাই, কিবা যায় আসে?' বলল রানা মৃদু হেসে। তারপর বলল, 'সন্ধের পর বিষ নিঃশ্বাস ছাড়তে শুরু করবে ভয়ঙ্কর গাছগুলো। দিন থাকতে একবার দেয়ালটা পার হতে পারলে আর কোন শালার তোয়াক্কা রাখব না। ঝেড়ে দৌড় দেব মোটর বোটটার দিকে। আর একবার ওটাতে চড়ে বসতে পারলে...'

একটা দরজার আড়ালে পূরবীর মুখোশটা দেখা গেল। হাতছানি দিয়ে ডাকল সোহানাকে।

সোহানা এগোতে যাচ্ছিল ওদিকে, চাপা কণ্ঠে বলল রানা, 'ওকে বলো দশ মিনিটের মধ্যে যেন বেরিয়ে আসে বাইরের বাগানে।'

অবাক হলো সোহানা। 'দশ মিনিটের মধ্যে···'

'হ্যাঁ। পালাচ্ছি আমরা। ইচ্ছে করলে ও-ও আসতে পারে সঙ্গে।'

'ও আসবে না,' বলল সোহানা।

'ওকে অবশ্য কাল বা পরশু উদ্ধার করতে পারবে আমাদের লোক, তবু বলে দেখো।'

'আসবে না।' বলেই দ্রুত পায়ে চলে গেল সোহানা দরজাটার দিকে পূরবীকে অসহিষ্ণু ভাবে হাত নাড়তে দেখে। রানা এগিয়ে গেল সেতু নামাবার প্রকাণ্ড চাকাটার দিকে।

প্রায় নিঃশব্দে নেমে গেল সেতুটা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সেতুর মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল রানা। যেন আনমনে সিগারেট টানছে, এমনি ভাব নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল চারপাশ। কেউ লক্ষ করছে বলে মনে হলো না। দু'মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সোহানা। একা।

'এল না?'

'না।'

'আজ রাতটা গুলজারের ঘরে কাটাতে হবে ওকে, তাও এল না?'

'না।'

'কি বলল?'

'কিছুই বলল না। শুধু এই জিনিসটা দিল।' কাপড়ের আড়াল থেকে একটা প্লায়ার্স বের করে দিল সোহানা রানার হাতে। চট করে পকেটে পুরল সেটা রানা। 'আমি জানতাম, আসবে না ও।'

'কেন?'

'এসে লাভ কি? লক্ষ করোনি, প-বর্গের একটা অক্ষরও উচ্চারণ করে না পূরবী?'

'না করলে কি হয়?' হালকা ভাবে বলল রানা।

'ও, জানো না তুমি? বলব তোমাকে পরে। গুলজারকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করবে পূরবী, চলো, এই সুযোগে এগোনো যাক।'

দশ মিনিটে বেরোনো গেল না। ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়াল ওরা। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে দুর্গের চারপাশের বাগান দেখে বেড়াচ্ছে ওরা, একজোড়া প্রাক-বিবাহ দম্পতি, বিভোর হয়ে আছে গল্পে। রানা খুঁজছে আসলে প্রাচীর ডিঙিয়ে বেরোবার সহজতম পথ। একা থাকলে এত ভাবনার কিছু ছিল না, সোহানা ডিঙোতে পারবে এমন জায়গা দরকার।

'কী ভয়ঙ্কর লোক!' কুৎসিত বাগানের দিকে চেয়ে বলল সোহানা।

'সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে, লোকটা যা বলে বা করে তার মধ্যে

আন্তরিকতার অভাব নেই, বিশ্বাস করে সে এসব মন-প্রাণ দিয়ে। কোন ব্যাপারে একবার বাঁকা হয়ে গেছে ওর মন, চিন্তা-ভাবনা—ওকে ফিরিয়ে আনার কোন রাস্তা নেই। ধর্ম হিসেবে নিয়েছে সে এসব। যাই হোক, সোহানা, তুমি এর পাল্লায় পড়লে কি করে?'

'চাংওয়া রেস্টুরেন্টে দেখা, কল্ল ভাল হাত দেখতে পারে, অতীতের অনেক কথা ঠিক ঠিক বলে দিল, বাড়ি নিয়ে এলাম একবার তোমার হাতটাও ওকে দিয়ে দেখাব মনে করে, তারপর আর কিছু মনে নেই—সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, আমি এখানে, বন্দী।'

'এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে, লজ্জা করে না, এখন পর্যন্ত কুমারী! কিন্তু একথা ও জানল কি করে?'

'কি জানি!'

'দেখলে তো, বড়দের কথা না শুনলে কেমন হয়?'

'কি রকম?' অবাক হয়ে রানার দিকে চাইল সোহানা।

'উঃ! কী চেষ্টাই না করেছি! না-কে আর হ্যাঁ করাতে পারিনি। বিয়ের পর, বিয়ের পর! এখন কেমন হলো? তখন রাজি হয়ে গেলে আজ এ অবস্থা হোত? এই জন্যেই লোকে বড়দের কথা...'

রানার পাঁজর লক্ষ্য করে কনুই চালাল সোহানা। লাফ দিয়ে সরে গেল রানা গুলি খাওয়া বাঘের মত।

'অ্যাই, তখন আমার কাঁধে হাত দিয়ে ওরকম করে আঁতকে উঠলে কেন?'

'কখন?'

'ওই যখন বলছিল লোকটা দারুণ মানিয়েছে আমাদের, খুব সুন্দর ম্যাচ হোত বিয়ে হলে?'

'ওহ্! এই কথাটা খুব মনে ধরেছে দেখছি? ওটা মনে নেই, ও যে বলেছিল এ বিয়ে হবার নয়?'

'ভুল বলেছিল। ও তো জানে না, আমার স্বপ্নের রাজপুত্র এসে গেছে এই শত্রুপুরীতে, দৈত্য-দানো-রাক্ষস-খোক্কস সব কচুকাটা করে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে আমাকে...'

'তারপর সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে সাতদিন সাত রাত ধরে ধুমধাম, হৈ-চৈ, খাওয়া-দাওয়া, নাচগান, সারা রাজ্য জুড়ে সে কি ফুর্তি, হাঁড়ি হাঁড়ি পোলাও, কোর্মা, বিরিয়ানী, দই—উঁহুঁ, সেটি হচ্ছে না। এক সের দই-এর দাম আট টাকা।'

'এহ্! কোন্ কথার মধ্যে কোন্ কথা! কল্পনার মধ্যে আবার দাম-দস্তুর কেন? সত্যিই তো আর বিয়ে হচ্ছে না আমাদের।'

'কি হচ্ছে তাহলে?'

'পালাতে গিয়ে রাজকন্যাসহ ধরা পড়ছে রাজপুত্র। বন্দী হচ্ছে আবার। পরদিন বলি দেয়া হচ্ছে রাজকন্যাকে। কেউ ঠেকাতে পারছে না।'

'আর একটু আশাবাদী হওয়া যায় না?'

কোমল, মিষ্টি একটা অনুভূতিপ্রবণ মন রয়েছে ওর মধ্যে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে দেখেছে সোহানা ওকে কোন কোন ছোটখাট ব্যাপারে। সেইসঙ্গে পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পেরেছে একটা দুর্দমনীয় পৌরুষ। সবটা মিলিয়েই মাসুদ রানা। জ্যান্ত এক মানুষ। সজীব, সচল। কোন একটা বিশেষণ দিয়ে বেঁধে ফেলা যায় না একে।

ও বলেছিল, এটাই এখন একমাত্র পথ। কিন্তু পারবে তো পৌঁছোতে?

আবার চিৎকার করে উঠল পূরবী। খানিক পর পরই ভেসে আসছে ওর যন্ত্রণা কাতর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। পূরবীর অবস্থা কল্পনা করে কুঁচকে উঠছে সোহানার গাল। ভয়ঙ্কর একটা মুখ ভেসে উঠছে ওর মানস চক্ষে। গুলজার! কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত মুখের একটা অংশে দগদগে ঘা। ঝলসে গেছে অ্যাসিড লেগে। আরও বীভৎস হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর চেহারাটা। কানা হয়ে গেছে একটা চোখ। পূরবীকে ওর ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। রাত্রির বুক চিরে দিচ্ছে পূরবীর কান্না, দুর্গের দেয়ালে দেয়ালে ঠোকর খেয়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি উঠছে সে কান্নার। দাঁতে দাঁত চেপে মাথা নাড়ছে সোহানা নীরব সমবেদনায়।

আসবে রানা। তাই সেজেছে সোহানা। কি ভাববে রানা কে জানে। সাজ দেখে হাসবে হয়তো। কিন্তু সারাদিন বন্ধ ঘরে বসে বসে কি করবে সে আর? সময়টা তো কাটাতে হবে? কিছুতেই কাটতে চায় না সময়। ডক্টর শিকদারের আদেশে দড়াম করে ওকে মেঝেতে আছড়ে ফেলে বাইরে থেকে দরজা আটকে দিয়ে চলে গেছে গুলজার। রানাকেও নিশ্চয়ই তাই করা হয়েছে? কি করে বেরোবে রানা? কি করে আসবে? অথচ না এলে কাল ওকে মরতে হবে। অবশ্য এখান থেকে বেরোতে না পারলে মরতে এমনিতেও হবে, আজ হোক, কাল হোক। এর ফলে কিছুটা সময় পাওয়া যাচ্ছে, এই যা।

হঠাৎ সোহানার মনে হলো, এইভাবে রানার ওপর নির্ভর করছে কেন সে? ওর নিজের কি কিছুই করবার নেই? ও-ও তো একজন এজেন্ট। রানা এসে পৌঁছামাত্র সব ভার, সব দায়িত্ব রানার কাঁধের ওপর ফেলে দিয়ে চুপচাপ হাল ছেড়ে বসে আছে কেন সে? নিঃসন্দেহে রানার যোগ্যতা ওর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাই বলে ওর ঘাড়ে চেপে বসবে কেন সে? বিপদ কেবল একা সোহানার নয়, রানা নিজেও রয়েছে এখন ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে। এখনও টের পায়নি, কিন্তু দু'দিনেই টের পেয়ে যাবে শিকদার যে রানা বায়োলজির ব-ও জানে না। তখন কী প্রচণ্ড আক্রোশে রানাকে নির্যাতন করবে শিকদার, ভাবতেও শিউরে উঠল সোহানা মনে মনে। বিপদ দু'জনেরই, এর থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে দু'জনকেই। একা রানার ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপানো দায়িত্বহীনের কাজ হবে। কিন্তু কি সাহায্যে আসতে পারে সে? সেজেগুজে বউ হয়ে বসে না থেকে ভেবে দেখবে সে কোন উপায় বের করা যায় কিনা?

ভাবতে বসল সোহানা। শিকদারের দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করতে হবে। ওর দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই এখন। প্রথম দুর্বলতা, রানার পরিচয় জানে না সে এখনও। এখনও ওকে একজন শিভালরাস যুবক

বৈজ্ঞানিক হিসেবেই জানে সে। দ্বিতীয় দুর্বলতা, শিকদার জানে না যে রানাকে সে হিপনোটাইজ করতে পারেনি। ফলে সোহানার গায়ে হাত দিলেই ইলেকট্রিক শক খাবে জেনে নিশ্চিন্ত আছে সে ওর কুমারীত্ব সম্পর্কে। তৃতীয় দুর্বলতা, নিজের বিপদ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই শিকদারের। ও জানে না, প্রয়োজন হলে ওকে খুন করতে একবিন্দু দ্বিধা করবে না রানা।

এই তৃতীয় পয়েন্টটা তেমন পছন্দ হলো না সোহানার। শিকদার জানে গুলজারকে কিভাবে আক্রমণ করেছিল রানা, কিভাবে আছড়ে ফেলেছিল এত বড় দানবটাকে মাটির ওপর, কাজেই কিছুটা সাবধান হয়ে যাবে সে রানার ব্যাপারে। তাছাড়া, বায়োকেমিস্ট্রির রিসার্চ স্কলারের কাছে তার স্ব-আবিষ্কৃত অ্যাসিড গান থাকাটা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার না হলেও মানুষের ওপর এর ব্যবহারটা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক ঠেকবে শিকদারের কাছে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে কতখানি বেপরোয়া লোক হলে বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারে এটা মানুষের উপর। সাবধান হয়ে যাবে শিকদার।

যাই হোক, চতুর্থ পয়েন্ট...আর কোন পয়েন্ট মনে এল না সোহানার। চিন্তার খেই হারিয়ে খানিকক্ষণ আবোলতাবোল ভেবে ফিরে গেল আজ সকালের ঘটনায়। ছবির মত ভেসে উঠছে প্রতিটা ঘটনা ওর মনের পর্দায়।

জীবনে এত ভয় সে পায়নি কখনও আর। ডুবে যাচ্ছে চোরাবালিতে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে, ডুবে যাচ্ছে রানাও। কোন রকম সাহায্য আশা করা যায় না ওর কাছ থেকে। তবু, এখনও ভাবলে হাসি পাচ্ছে সোহানার, কেন যেন ছোট্ট একটু অভিমান উথলে উঠেছিল ওর বুকের ভিতর। রানার ওপর অভিমান—কই, পারলে না তো বাঁচাতে। বুক পর্যন্ত উঠে এল বালি, চিবুকে এসে ঠেকল তারপর। চেয়ে রয়েছে দু'জন দু'জনের চোখে। হঠাৎ আশ্চর্য একটুকরো হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। কলন—বিদায়!

চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে পড়ল সোহানার। কিছুই বলা হলো না রানাকে। ঠোঁট চলে গেছে বালির নিচে। ডুবে গেল নাক। শ্বাস নেয়া যাচ্ছে না আর। চোখের পাপড়িতে সুড়সুড়ি লাগতেই চোখ বুজল সে। স্পষ্ট অনুভব করতে পারল কপাল বেয়ে উঠে গেল বালি, ডুবে গেল সে বালির নিচে, নামছে আরও। জ্যান্ত কবর হয়ে গেছে ওর।

কোমরের কাছে কিসের স্পর্শ। একটা হাত জড়িয়ে ধরল সোহানার কোমর। টানছে ওকে ওপর দিকে! এত জোর পেল কি করে রানা? আশায় দুলে উঠল সোহানার বুক। নিশ্চয়ই শক্ত মাটি ঠেকেছে রানার পায়ে! টানছে রানা। কোমরে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করতে পারছে সোহানা। প্রাণপণ শক্তিতে টানছে রানা। হঠাৎ ভয় পেল সোহানা—এই কবর থেকে ওকে টেনে তুলতে পারবে না তো রানা? চাপ বাড়ল আরও। ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাচ্ছে শরীরটা।

নবজাতকের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বুক ভরে শ্বাস নিল সোহানা। চোখ মেলে দেখল হাসছে রানা।

'ধরা পড়ে গেলাম, সোহানা। কিন্তু মনে রেখো, বেঁচে আছি আমরা, হতাশ

হওয়ার কিছুই নেই।'

সামলে নিল সোহানা অল্পক্ষণেই। দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এখন। হালকা লাগছে।

'মাটি পেয়েছ তুমি? নিচে?'

'হ্যাঁ। বোঝা যাচ্ছে এই ফাঁদ মেয়েমানুষের জন্যে তৈরি করেনি শিকদার। এটা স্ট্রিক্টলি ফর মেল প্রিজনার্স। এই পর্যন্ত এসে ঠেকে গেছি, আর নামতে পারছি না। নড়তেও পারছি না জায়গা থেকে। যতক্ষণ না ওরা এসে উদ্ধার করবে, থাকতে হবে এইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে।'

'এ চোরাবালি শিকদারের তৈরি? চোরাবালি তৈরি করা যায়?' বিস্মিত সোহানা।

'নিশ্চয়ই। কেবল দেয়ালের ওপর ইলেকট্রিফায়েড ওয়্যার দিয়েই নিশ্চিন্ত হতে পারেনি শিকদার, চোরাবালি দিয়ে ঘিরে দিয়েছে সম্পূর্ণ এলাকাটা।'

'কিন্তু তুমি না বললে একটা ছাগলকে হেঁটে বেড়াতে দেখেছ এর ওপর?'

'হ্যাঁ। তখন এটা শুধু বালি ছিল। আমরা যেই দৌড় দিয়েছি, অমনি চোরাবালি হয়ে গেছে।'

'যাঃ! কী যা তা বলছ!'

'ঠিকই বলছি। সাধারণ বালি থেকে চোরাবালির শুধু একটিই মাত্র তফাৎ। ফোয়ারা। অসংখ্য ফোয়ারা বসানো আছে এই প্রাচীর-ঘেরা বালির নিচে। আমাদের দৌড়োতে দেখেই রিজার্ভ ট্যাংকের চাবি খুলে দেয়া হয়েছে। অমনি পানির প্রেশারে চোরাবালি হয়ে গেছে পাঁচ মিনিট আগের এই সাধারণ বালি...এই যে, এসে গেছে আমাদের রেসকিউ পার্টি। তার আগে আমাদের জরুরী আলাপটা সেরে নিই।' সোহানার চোখের ওপর রাখল রানা ওর রহস্যময় সম্মোহনী চোখ। 'শোনো, সোহানা, আজ রাতে আমি আসছি তোমার ঘরে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। ভুল বুঝো না, প্লীজ। সময় দরকার আমাদের। হাতে সময় নেই। তোমার মৃত্যুটা একদিন পিছিয়ে দিতে পারলেও লাভ। বুঝতে পেরেছ?'

বুঝতে পেরেছে সোহানা। চোখের পাপড়ি দুটো কাঁপল বার কয়েক, ধীরে ধীরে নত হলো দৃষ্টি, মাথাটা সামান্য একটু বাঁ দিকে হেলিয়ে সম্মতি জানাল। ঠোঁটে কুমারীর ভীরু হাসি।

চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে তোলা হলো ওদের। সোহানা আশা করেছিল মারধোর করবে বুঝি, কিন্তু গায়ে হাত দিল না গুলজার। ওকে শুধু ওদেরকে ধরে আনার হুকুম দেয়া হয়েছে, অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করছে সে ভয়ঙ্কর ভাবে আহত অবস্থাতেও। মুখের দিকে তাকানো যায় না, এমন বীভৎস হয়ে গেছে চেহারাটা।

সব শুনে এবং দেখে কিছুক্ষণ রাগে কাঁপল শিকদার, তারপর উলফাতের হাত থেকে ঝট করে বল পেনটা তুলে নিয়েই টিপে দিল রানার মুখ লক্ষ্য করে।

সাঁৎ করে একপাশে মাথা সরাল রানা। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না, অ্যাসিড শেষ হয়ে গিয়েছিল আগেই, পিচিক্ করে সামান্য একটু অ্যাসিড বের হয়ে পড়ল রানার পায়ের কাছে. পেনের মুখ থেকে গোটা কয়েক বুদবুদ বেরোল, তারপর শুধু

প্রেশারাইজড্ এয়ার।

প্লায়ার্সটা দেখেই পূরবীকে ডেকে পাঠাল শিকদার। নিঃসঙ্কোচে এসে দাঁড়াল পূরবী, নিঃশঙ্ক চিত্তে উত্তর দিল, হ্যাঁ, ও-ই দিয়েছে ওটা রানাকে। ওকে বিদায় করে দিয়ে রানার দিকে ফিরল শিকদার। সামলে নিয়েছে অনেকটা।

'আপনি যে অপরাধ করেছেন তার ক্ষমা নেই। ভয়ানক শাস্তি অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে, ডক্টর রানা। বাট দ্যাট ক্যান ওয়েট। আপনার জন্যে ইনজিনিয়াস কিছু শাস্তি ভেবে বের করতে হবে। সহজে হত্যা করা হবে না আপনাকে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। আপনার বিদ্যাটুকু শুষে নিতে হবে আগে।' গুলজারের দিকে ফিরল শিকদার। 'গুলজার, নিয়ে যাও এদের। যার যার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও।'

প্রচণ্ড এক ধাক্কায় সোহানাকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে রানাকে নিয়ে চলে গেছে গুলজার।

দুপুর গড়িয়ে গেল, বিকেল পেরিয়ে এল সন্ধ্যা। আকাশ পাতাল ভাবল সোহানা, চুপচাপ একা ঘরে কাটতেই চায় না সময়। সন্ধে থেকেই আত্মসচেতনতা বাড়তে শুরু করল ওর। চমকে উঠল আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে। নোংরা ভূত হয়ে রয়েছে সে। সারা গায়ে, জামাকাপড়ে, চুলে বালি কিচকিচ করছে।

পরিষ্কার জামা কাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকল সোহানা। প্রথমে শ্যাম্পু করল চুলে, তারপর ভাল করে সাবান ঘষে পরিষ্কার করল গা-হাত-পা। স্নান সেরে পরিষ্কার কাপড় পরে দাঁড়াল এসে দক্ষিণের জানালার ধারে। দূর থেকে সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসছে আবছাভাবে। বইছে মৃদু হাওয়া। হাওয়া লাগছে এসে সোহানার মনেও। নিজের বুকের ভিতরও শুনতে পাচ্ছে সে সমুদ্রের অস্পষ্ট কলোচ্ছাস। কেমন যেন উথাল-পাথাল দিশেহারা লাগছে। সময় আর কাটতেই চায় না।

ঠিক আটটার সময় খাবার পৌঁছে দিয়ে গেছে পূরবী। ওর পেছনে কামাতুর কুকুরের মত লেগে রয়েছে গুলজার। পূরবী বেরিয়ে যেতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। আসবে কি করে রানা!

সামান্য কিছু মুখে দিয়ে উঠে পড়েছে সোহানা। খেতে পারেনি। অনেক সময় নিয়ে চুল আঁচড়ে অনেক যত্নে খোঁপা বেঁধেছে। তবু সময় কাটে না। শাড়িটা খুলে সুন্দর করে কুঁচি দিয়ে আবার পরেছে। হালকা করে লিপস্টিক মেখেছে, পাউডারের পাফ বুলিয়েছে গালে, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে শুনেছে সমুদ্রের গর্জন। তাও সময় যায় না দেখে লাল একটা টিপ পরেছে কপালে। শ্যানেল নাম্বার ফাইভ নেই ইন্টিমেট মেখেছে সে তার বদলে। বুকের ভিতরটা কেমন জানি করছে। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই, জানে সোহানা, কিন্তু সব জেনেও দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারছে কই? আসবে রানা, তারপর···। থেকে থেকে কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠছে সোহানার। শুকিয়ে আসছে জিভ।

খুট করে শব্দ হলো দরজায়। ধড়াস করে উঠল সোহানার বুক। আগল খুলে

যাচ্ছে!

লাল স্ট্রাইপের একটা হলুদ জ্যাকেট দেখা গেল দরজার ফাঁকে। পরমূহূর্তে ঘরে ঢুকল মাসুদ রানা। চট করে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে ছিটকিনি লাগাবার জন্যে হাত তুলল। ছিটকিনি নেই এঘরে। কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসে দাঁড়াল সোহানার সামনে।

আশ্চর্য! লোকটা সবকিছু বোঝে কি করে? রানার চোখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারল সোহানা, ওর লজ্জা, ভয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, আড়ষ্টতা—সব পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছে লোকটা। অদ্ভুত একটুকরো হাসি রানার ঠোঁটে। দ্রুত কেটে যাচ্ছে সোহানার মনের যত মেঘ। কিন্তু মাথা ঝুলে পড়ছে কেন নিচের দিকে?

একটা বলিষ্ঠ হাত জড়িয়ে ধরল সোহানার ক্ষীণ কটি, চিবুক ধরে মুখটা ধীরে ধীরে উঁচু করল আরেক হাত।

'ভয় করছে, সোহানা?'

মাথা নাড়ল সোহানা। করছে। ঠোঁট ভেজাল জিভ দিয়ে। আকুল দুই নয়ন রাখল রানার চোখে।

'এর ফলে কোনদিন আমাকে ছোট ভাববে না তো, রানা?'

'সমান ভাবব।'

'তুমি না হয়ে অন্য কেউ হলে মৃত্যুকেই বেছে নিতাম আমি, বিশ্বাস করো?'

'করি গো করি।' হাসল রানা। 'মিছেমিছিই ভাবছ তুমি, সোহানা। জান বাঁচানো ফরজ; উপায় নেই। টেক ইট অ্যাজ এ স্পোর্ট!'

ধীরে ধীরে নেমে এল রানার ঠোঁট।

আধঘণ্টা চুপচাপ। শুধু টুকরো টুকরো এক-আধটা কথা।

'লজ্জার কি আছে! দাঁড়াও, আমি খুলে দিচ্ছি।'

খানিকক্ষণ চুপ।

'দারুণ লাগছে! চাও তো আমার চোখের দিকে?'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

'অ্যাই অসভ্য! হাত সরাও!'

খাটের স্প্রিং-এ মৃদু আওয়াজ।

'বাতিটা নিভিয়ে দিই।'

'আপনিই নিভে যাবে একটু পর। এগারোটা বাজে প্রায়।'

আবার খানিক চুপচাপ।

'এর মধ্যে যদি কেউ ঢুকে পড়ে ঘরে? দেখে ফেলবে আমাদের!'

'দেখুক না।'

'এই অবস্থায়!'

'চুপ করো তো।'

খানিক চুপ।

'অ্যাই, যদি মা হয়ে যাই?'

'কি রকমের মা? ছেলে না মেয়ের?'
'অ্যাই, সুড়সুড়ি লাগছে!'
দপ করে নিভে গেল বাতি।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গর্জন করে উঠল বাঘটা।
চমকে উঠল সোহানা। দাঁতে দাঁত চাপল।
'উহ্! রানা! মা-গো!'

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। দপ করে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল বাতি। চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে শিকদার। পিছনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গুলজার। রানার বাম বাহুতে মাথা রেখে শুয়ে ছিল সোহানা। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। দুই হাতে লজ্জা ঢাকল।

পাশ ফিরল রানা।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রানা ও সোহানার শরীরে চোখ বোলাল শিকদার। মেঝের ওপর এলোমেলো ভাবে পড়ে থাকা শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট, শাড়ি, ব্লাউস, বেসিয়ার, পেটিকোটের ওপর থেকে ঘুরে এসে স্থির হলো দৃষ্টিটা রানার চোখে। শিকদারের চোখে প্রতিহিংসার বিষ। ধক্‌ধক্ জ্বলছে চোখ জোড়া।

পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই সামলে নিল শিকদার। দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ক্রোধের আগুন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল রানা ওর প্রচণ্ড ক্ষমতা দেখে। এই অবস্থায় মাথা ঠিক রাখা সহজ কথা নয়।

'ভুল আমারই হয়েছিল।' শান্ত শিকদারের কণ্ঠস্বর। 'আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। পিস্তল আর ট্র্যান্সমিটার দেখেই পরিষ্কার বুঝে নেয়া উচিত ছিল সোহানার অফিস থেকে পাঠানো হয়েছে তোমাকে। বুঝে ফেলতাম। কিন্তু তোমার সম্মোহিত হওয়ার অভিনয় গুলিয়ে দিয়েছিল আমার স্বাভাবিক বুদ্ধি। আজ দুপুরের ঘটনাতেও আমি তোমাকে ডক্টর মাসুদ রানা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি। মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল আমার। কিন্তু যা ঘটবার ঘটে গেছে। আমার নিজের দোষ আমি কারও ওপর চাপাতে চাই না। তাছাড়া আমার এলাকায় আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তুমি দুর্দান্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। এত দুঃসাহসী লোক আমি জীবনে দেখিনি। ভাবছি, তোমার সাহসের জন্যে আমার পুরস্কৃত করা উচিত তোমাকে। বিয়ে দিলে কেমন হয়?...ঠিক আছে। বিয়ে দিয়ে দেব তোমাদের দু'জনের। কাল রাত এগারোটায় তোমাদের বিয়ে। ততক্ষণ একটু ধৈর্য ধরে দু'জনকে দুই ঘরে থাকতে হবে। গুলজার...'

ছোট্ট একটা গর্জন তুলে সাড়া দিল গুলজার।

পেছনে না ফিরে আদেশ দিল শিকদার। 'একে এর ঘরে নিয়ে যাও। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় থাকবে। আর উলফাতকে পাঠিয়ে দেবে আমার কাছে। লাইব্রেরিতে আছি আমি বারোটা পর্যন্ত।'

কাউকে কোনকিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল শিকদার।

জ্যাকেট পরবার আর সময় পাওয়া গেল না, প্যান্টের একটা বোতাম লাগাতে

না লাগাতেই রানার চুল লক্ষ্য করে বাঘের মত থাবা চালাল গুলজার।

বেড়াল ছানার মত ঝুলন্ত অবস্থায় বেরিয়ে গেল প্রেয়সীর ঘর থেকে অসম-সাহসী বীর মাসুদ রানা।

নয়

সারাদিন দেখা নেই সোহানার।

এখানকার সবই চলছে যেন ঠিক আগের মত, স্বাভাবিক নিয়মে। তফাৎ, রানার পেছনে ছায়ার মত লেগে রয়েছে গুলজার সর্বক্ষণ, সতর্ক, প্রস্তুত; আর সোহানাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। একটা চিঠি লিখে নিয়ে গিয়েছিল রানা সকালে নাস্তার টেবিলে। নতুন একটা প্ল্যান খেলেছে ওর মাথায়। কিন্তু সোহানাকে আগে থেকে জানাতে না পারলে কার্যকরী করা যাবে না প্ল্যানটা। পূরবীর মাধ্যমে পাচার করা গেল না চিঠিটা। সে-ও অনুপস্থিত। গত রাতের ধকল নিশ্চয়ই সামলে উঠতে পারেনি বেচারী এখনও। খাবার টেবিলে বেয়ারাগিরি করছে উলফাত।

বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে টেবিলে বসে আছে শিকদার। একা। অনেক কষ্ট স্বীকার করে বলি দেয়ার জন্যে কুমারী এক যুবতী নারী সংগ্রহ করেছিল সে, তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছে রানা, ভয়ঙ্কর আক্রোশে ফেটে পড়বার কথা, কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই ওর মধ্যে। নীরবে খেয়ে চলেছে। রানাও চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়ল।

দুপুরেও ঠিক একই অবস্থা। সোহানা নেই। একা বসে রানার জন্যে অপেক্ষা করছে শিকদার। চুপচাপ খাওয়া শেষ করল দু'জন। শিকদারের মধ্যে আলাপ আলোচনার কোন লক্ষণ না দেখে শেষ পর্যন্ত কথা তুলল রানাই।

'শুনেছিলাম ভয়ঙ্কর শাস্তি অপেক্ষা করছে আমার জন্যে? কোথায়?'

নিস্পৃহ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শিকদার কয়েক সেকেণ্ড রানার চোখের দিকে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'অত ব্যস্ত হবার কি আছে, মিস্টার মাসুদ রানা? শাস্তি আমি ঠিকই দেব। তুলনাহীন, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। কিন্তু তার আগে আমি আপনাকে সুখী দেখতে চাই।' ভয়ঙ্কর এক টুকরো চতুর হাসি খেলে গেল শিকদারের ঠোঁটের কোণে। 'বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর শুরু হবে। নিজের চোখে দেখবেন, নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করবেন, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবেন এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে। বিভীষিকাময় একটা মাস পড়ে রয়েছে আপনার সামনে। আগে থেকে এর বেশি বলে আপনাকে মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ আমি দেব না।' উঠে দাঁড়াল শিকদার। 'তৈরি থাকবেন, আজ রাত এগারোটায় বিয়ে।'

'সোহানা কোথায়?' শিকদার ঘুরে দাঁড়াবার আগেই চট করে জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওর সঙ্গে কথা আছে আমার।'

আবার সেই চতুর হাসিটা খেলে গেল শিকদারের ঠোঁটে। মাথা নাড়ল। 'এত উতলা হবেন না। অনেক সময় পাবেন। সারাটা রাত ধরে বলতে পারবেন মনের সব কথা। একান্ত গোপনে, নিরালায়।'

মচমচ জুতোর শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল শিকদার ডাইনিং রুম থেকে।

রানা ফিরে এল নিজের ঘরে।

ওয়ারড্রোবের ভিতর একটা বোতাম টিপলে খুলে যায় একটা সুড়ঙ্গ পথের দরজা। সেই পথে দশ গজ গেলে আরেকটা দরজা, তারপর পুব-পশ্চিমে লম্বা একটা করিডর। গত রাতেই চেষ্টা করে দেখেছে রানা আবার। ওপাশের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। এ ঘর থেকে বেরোবার কোন উপায় নেই।

রানাকে সুখী করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ যে শিকদারের মধ্যে নেই, সেটা বুঝতে বুদ্ধি লাগে না কিন্তু ঠিক কোন্ ধরনের মারাত্মক পরিকল্পনা চলেছে ওর বিকৃত মস্তিষ্কে হাজার ভেবেও বের করতে পারল না রানা। নিশ্চয়ই জঘন্য কোন মতলব রয়েছে এসবের পেছনে। কিন্তু কি সেটা? মতলবটা জানতে না পারলে সেটা বানচাল করবার প্রশ্নই ওঠে না। কি মতলব?

অনেক ভেবেও বের করতে পারল না রানা, ঠিক কি ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে শিকদারের মাথায়, কি করতে যাচ্ছে সে, হঠাৎ বিয়ে দেয়ার জন্যে খেপে উঠল কেন লোকটা। বুঝতে পারছে রানা, শেষ সময় উপস্থিত। এখন প্রথম সুযোগেই রুখে দাঁড়াতে হবে, শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে এই ভয়ঙ্কর পিশাচের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার; কিন্তু সোহানার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত এক পা-ও এগোতে পারছে না সে। তার আগেই অপূরণীয় কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না তো?

ঠিক আটটায় সাপার খেয়ে এল রানা নিচে থেকে। সোহানা নেই। খুশি খুশি লাগছে শিকদারকে। কথা হলো না কোন। খাওয়া শেষ করে লাইব্রেরিতে চলে গেল শিকদার, রানা চলে এল ওর বন্দীশালায়।

রাত ঠিক সাড়ে দশটায় ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজাটা। শিকদার।

'শুয়ে কেন? তৈরি হয়ে নিন। বিয়ে!'

ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসল রানা। সরাসরি চাইল শিকদারের চোখে। 'কি চান আপনি আসলে?'

'বলেছি তো, সুখী দেখতে চাই আপনাকে।'

'এতে আপনার কি লাভ? তাছাড়া সোহানাকে বিয়ে করলে যে আমি সুখী হব, কে বলল আপনাকে?'

'আমি জানি। আপনাদের দু'জনের দিকে একবার চাইলেই বোঝা যায় সেটা: আপনারা পরস্পরের প্রতি যে প্রচণ্ড এক ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশন অনুভব করবেন, সেটা আপনাদের রাশিতেই লেখা আছে। চুম্বকের মত টানছেন আপনারা একে অপরকে। নিয়তির অমোঘ টান। খণ্ডাবার কোন উপায় নেই। নিন উঠে পড়ুন।'

'ওসব ধানাই-পানাই বাদ দিয়ে মতলবটা বলে ফেলুন সোজাসুজি। নইলে উঠছি না আমি বিছানা ছেড়ে।'

'বলপ্রয়োগ করবে গুলজার। সেটা কি ভাল হবে?' সহজ কণ্ঠে বলল শিকদার।

'খুব খারাপ হবে। তার চেয়ে মানে মানে উঠে পড়াই ভাল। ঠিক আছে, উঠছি। আপনারা বাইরে গিয়ে দাঁড়ান, তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমি পাঁচ মিনিটে।'

'তাড়াহুড়োর কিছুই নেই,' বলল শিকদার। রানার দ্রুত মত পরিবর্তনে সন্দেহের ছায়া খেলে গেল ওর চোখে। 'রেডি হয়ে চলে আসুন ডাইনিং রুমে। ওখান থেকেই রওনা হবে বরযাত্রীরা।'

দরজাটা দু'পাট হাঁ করে খুলে রেখে চলে গেল শিকদার। রানা লক্ষ করল গুলজারও চলে গেল ওর পেছন পেছন। মনে মনে হাসল রানা। একটা কানাকড়ি দিয়েও বিশ্বাস করে না ওকে শিকদার। কাছাকাছিই কোন থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে গুলজার রানার নতুন কোন দুরভিসন্ধি থাকলে সেটা বানচাল করবার জন্যে।

দ্রুত হাতে কাপড় পরল রানা। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কি ঘটতে চলেছে, কোন্ ধরনের অবস্থার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নেবে, জানে না সে। আগামী সবকিছুই অজানা, অনিশ্চিত। বুকের ভিতর অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ বোধ করল সে। আশ্চর্য একটা শিহরণ অনুভব করল হৃৎপিণ্ডের কাছটায়। বাথরুমে ঢুকে জুতোর গোড়ালিতে লুকোনো ছুরিটা পরীক্ষা করল। একটা ছোট বোতাম টিপ দিতেই ক্লিক শব্দ তুলে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে চার ইঞ্চি ব্লেডের ছুরিটা কয়েক ভাঁজ খুলে গিয়ে। একমাত্র সম্বল এটাই। গুলজারকে ঠেকানো যাবে না এটা দিয়ে, জানে রানা। পিস্তল দিয়েই ওকে ঠেকানো মুশকিল, আর এটা তো সামান্য একটা ছুরি। তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, সযত্নে ভাঁজ করে যথাস্থানে রেখে দিল ওটা। একটা সিগারেট ধরাল। প্রয়োজন-মুহূর্তে অনেক কাজে দিতে পারে সিগারেটের মাথার এই সামান্য আগুনও। কিছুদিন আগে এই আগুন গালে ঠেসে ধরে উদ্ধার পেয়েছিল রানা এক স্টেনগানধারী হাইজ্যাকারের হাত থেকে। যাই হোক, বুক ভরে শ্বাস নিল সে বার তিনেক, তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সোহানা!

শিকদারের লাইব্রেরির দরজাটা একপাট খোলা। ডেস্কের ওপর ঝুঁকে কি যেন করছে সোহানা এদিকে পেছন ফিরে। পরনে লাল বেনারসী, হাতে ওর সাদা ব্যাগটা। ইন্টিমেটের গন্ধ পেল রানা।

ধড়াস করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। সত্যি বিয়ে দিতে যাচ্ছে নাকি শিকদার ওদের? বউ সেজে কি করছে সোহানা এখানে?

লাইব্রেরিতে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল রানা। তিনটে ব্যাপার একসঙ্গে লক্ষ করল সে। প্রথম, কি যেন খুঁজছে সোহানা শিকদারের ডেস্কের ড্রয়ারে ব্যস্ত হাতে। দ্বিতীয়, দশ হাত দূরে প্রকাণ্ড একটা থামের আড়ালে নড়ে উঠেছে একটা ছায়া। আর তৃতীয়, ডাইনিং রুমের দরজা খোলার একটা অস্পষ্ট আওয়াজ এসেছে রানার কানে। পা বাড়াল রানা, ঠিক সেই সময় ডাইনিং রুমের দরজা খুলে মুখ বের করল শিকদার।

'কি ব্যাপার? দেরি কেন? এগারোটায় নিভে যাবে বাতি, তার আগেই সারতে হবে সব কাজ। জলদি!' রানা ঘরে ঢুকতেই গুলজারকে ডাকল শিকদার। দরজায় এসে দাঁড়াল দানবটা। শিকদার জিজ্ঞেস করল, 'চাবি নিয়েছ তো?' গুলজারকে মাথা নেড়ে সায় দিতে দেখে বলল, 'ঠিক আছে, চলুন, তাহলে এগোনো যাক।'

গুলজারের হাতে ধরা স্বাভাবিক আকারের চেয়ে চারগুণ বড় গোটা চারেক মোমবাতির দিকে রানাকে চাইতে দেখে বলল, 'ওগুলো বিশেষ এক ধরনের মোমবাতি। মরা মানুষের চর্বি দিয়ে তৈরি। নিন, এগোন। আপনি প্রথম।'

রওনা হলো উদ্ভট বরযাত্রীরা সার বেঁধে। প্রথমে রানা, তারপর শিকদার, পেছনে হাফপ্যান্ট পরা গুলজার বেগ। এক করিডর থেকে আরেক করিডর, সেখান থেকে আরেকটা, এইভাবে এগিয়ে চলল ওরা। রানার মনে হলো যূপকাষ্ঠের দিকে নিয়ে চলেছে ওকে এক ভয়ঙ্কর কাপালিক। বিয়ে নয়, বলি দেয়া হবে ওকে। খিচে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল সে। সোহানার কথাটাও ভাবতে হবে ওকে। সোহানাকে শিকদারের ড্রয়ার ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখে, যদিও দুরাশা, তবু ক্ষীণ একটা আলোর রশ্মি দেখতে পেয়েছে সে। হয়তো মুক্তির কোন পথ পাওয়া যেতেও পারে। অপেক্ষা করাই ভাল।

একটা চত্বর পেরিয়ে দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড এক দরজা। বন্ধ। এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দিল গুলজার। রানা দেখল, সামনে সিঁড়ি। নিচে নেমে গেছে সিঁড়ির ধাপ। নামতে শুরু করল রানা।

বেশ বড়সড় একটা ঘর। মগ জলদস্যুরা কেন মাটির নিচে এই ঘর তৈরি করেছিল বোঝা গেল না, কিন্তু এখন এই ঘরটা কি কাজে ব্যবহৃত হয় বুঝতে পারল রানা পরিষ্কার। একটা মস্ত পাথরের মূর্তি বসানো আছে এক প্রান্তে একটা বেদির ওপর। অদ্ভুত এক মূর্তি। পা আর মাথা ছাগলের, কিন্তু হাত আর শরীরের বাকি অংশ মানুষের। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের সংমিশ্রণ। ওপরটুকু স্ত্রীলোক, নিচেরটুকু পুরুষ। উলঙ্গ। পায়ের কাছে দুটো সাপ। পিঠে প্রকাণ্ড দুটো বাদুড়ের ডানা দু'পাশে ছড়ানো। দাড়িওয়ালা ছাগলের দুই শিং-এর মাঝখানে অদ্ভুত একটা ত্রিশূলাকার মুকুট। বেদিমূলের বেশ খানিকটা জায়গা খয়েরী হয়ে রয়েছে। রক্তের দাগ চিনতে ভুল হলো না রানার। বলি দেয়া হয় এখানে।

পঁচিশ ওয়াট বালবের ম্লান আলোয় আলোকিত ঘরটা। চারপাশে চোখ বোলাল রানা. যে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছে ওরা সেটা ছাড়াও আরও তিনটে সিঁড়ি নেমে এসেছে এই ঘরে তিন দিক থেকে। দেয়াল ভর্তি মাকড়সার জাল, মেঝেতে ইঁদুর আর ছুঁচোর মল।

রানাকে দাঁড় করানো হলো পাথরের মূর্তিটার সামনে। মোম বাতিগুলো জেলে একটা বসিয়ে দেয়া হলো মুকুটের ওপর, বাকি তিনটে বসানো হলো মূর্তির তিন দিকে। বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করছে শিকদার। গ্রীক, ল্যাটিন, না হিব্রু ভাষায় মন্ত্র পাঠ হচ্ছে বুঝতে পারল না রানা। সংস্কৃত বা বাংলা হওয়াও বিচিত্র নয়। একটি শব্দও পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করছে না শিকদার, শুধু গমগমে, গম্ভীর একটা সুর আসছে কানে। মিনিট তিনেক মন্ত্র পাঠ করে কুৎসিত মূর্তিটার পায়ে চুমো খেলো শিকদার। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফিরল রানার দিকে।

পিছনে পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরাল রানা। পুব দিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল উলফাত, তার পেছনে সোহানা। কনে সাজাতে কোন রকমের কার্পণ্য করেনি শিকদার। দামী বেনারসী, দুই হাতের প্রায় কনুই পর্যন্ত সোনার চুড়ি, বালা, চূড়,

গলায় হীরে সেট করা জড়োয়া। আধহাত ঘোমটা টেনে ব্রীড়াবনত ভঙ্গিতে আড়ষ্ট পা ফেলে এগিয়ে এল সোহানা।

'এসো এসো, সোহানা। এইখানটায় দাঁড়াও। বাহ্, বেজায় মানিয়েছে দু'জনকে। হাসো, রানা, মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে কেন? আজ তো তোমাদেরই দিন! খুশির দিন। জীবনের এই একটি দিন পৃথিবীর সব পুরুষ রাজা, সব মেয়ে রানী।'

হৈ-হৈ করে দশ বারোজনের কণ্ঠে হেসে উঠল উলফাত। ঝট করে ফিরল শিকদার ওর দিকে।

'তুমি এখানে কি করছ? যাও। পাহারায় থাকো গে। সতর্ক থাকবে, কান খোলা রাখবে।'

বিমর্ষ বদনে চলে গেল উলফাত। শিকদার ফিরল বর-কনের দিকে। 'এবার বিয়েটা পড়িয়ে দেয়া যাক।'

খুবই সাদামাঠা ভাবে, কোন রকমে দায়-সারা গোছের করে বিয়ে পড়ানো হলো। রানা বুঝতে পারছে, বিয়ে পড়ানোটা আসল ব্যাপার নয়, এসবের পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। ভিতর ভিতর আশ্চর্য রকমের উত্তেজিত হয়ে আছে শিকদার, চাপা উত্তেজনায় হাত দুটো কাঁপছে ওর। মনে হচ্ছে পৈশাচিক কোন আনন্দ চেপে রেখেছে সে মনের ভিতর, ছটফট করছে প্রকাশ করতে না পেরে।

'জনাব মাসুদ রানা, এ বিবাহ আপনি কবুল করছেন?'

কেমন উদ্ভট লাগছে রানার কাছে সবকিছু। সে-ও চাইছে, এসব আজেবাজে ব্যাপারগুলো চুকে গিয়ে শিকদারের আসল উদ্দেশ্যটা প্রকাশিত হোক। বলল, 'করছি।'

'উঁহুঁ। হলো না। বলুন কবুল?'

'কবুল।'

'আচ্ছা, এইবার কনের মত গ্রহণ করা যাক। বেগম সোহানা চৌধুরী, দুই লক্ষ টাকা দেনমোহরের বিনিময়ে জনাব ইমতিয়াজ চৌধুরীর পুত্র জনাব মাসুদ রানা আপনার পাণি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, আপনি এ বিবাহে সম্মত আছেন?'

ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সোহানা। কোন জবাব নেই।

'এ বিবাহে আপনার সম্মতি আছে?' আবার জিজ্ঞেস করল শিকদার। 'লজ্জার কোন কারণ নাই। জবাব দিন।'

কোন জবাব নেই। মুচকি হাসি খেলে গেল রানার ঠোঁটে। রানার মত সোহানাও জানে এ বিয়ের কোন মূল্য নেই, এসব ছেলেখেলা, তবু হাজার হোক মেয়েমানুষ, কবুল বলতে জড়িয়ে আসছে জিভ। সারাজীবনের জন্যে এই একটি কথা বলে ওরা একবার! কত দ্বিধা, কত ভয়, শঙ্কা। ও বাবা! টপ করে এক ফোঁটা পানিও ঝরে পড়ল ঘোমটার ফাঁক দিয়ে।

পানি দেখে হাসল শিকদার।

'দেখুন, বেগম সোহানা চৌধুরী, আপনার পিতা মাতা কেহ জীবিত নাই। আপনাকে বিদায় দিয়ে হা-হুতাশ করার কেউ নাই এখানে। কাজেই পিত্রালয় ছেড়ে

পরের ঘরে যেতে আপনার বুক ফেটে যাওয়ার ভান করতে হবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা নিতান্তই বেমানান। এই বিবাহে আপনার সম্মতি আছে কিনা আপনি নিঃসঙ্কোচে জানাতে পারেন, কেহ আপনাকে নির্লজ্জ মনে করবে না। বলুন আপনি সম্মত?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সোহানা।

'উঁহুঁ! এতে হবে না। মুখ দিয়ে বলতে হবে। বলুন, কবুল?'

চুপ করে রইল সোহানা।

'ঠিক আছে, আরও সংক্ষেপ করে দিচ্ছি কঠিন শব্দটা। বলুন, রাজি?'

মৃদুকণ্ঠে বলল সোহানা, 'রাজি।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রানা। প্রথম পর্ব চুকল, এবার শুরু হবে দ্বিতীয় পর্ব। দেখা যাক কি হয়।

তৃপ্তির হাসি শিকদারের ঠোঁটে।

'বেশ। আমি আমার দেবতাকে সাক্ষী রেখে জনাব মাসুদ রানার হাতে তুলে দিচ্ছি সোহানা চৌধুরীর হাত।' সোহানার ডান হাত তুলে ধরিয়ে দেয়া হলো রানার বাম হাতে। 'এবার দৃষ্টি বিনিময়। অনেক কিছুই বিনিময় হয়ে গেছে আপনাদের মধ্যে—তবু নিয়ম যেটা, সেটা মানতেই হয়! মুখ দেখার জন্যে আয়নার ব্যবস্থা নেই, দুঃখিত! ঘোমটা সরাতে হবে আপনাকে। বলুন, জনাব মাসুদ রানা, কি দেখছেন?'

রানা জানে, মুখ দেখে বলতে হয়—চাঁদ দেখছি। আগে ভাগেই বলে দিল, 'চাঁদ দেখছি।'

'না দেখে বললে চলবে না। ঘোমটা সরাতে হবে। সরান ঘোমটা। মুখ দেখে বলুন, কি দেখছেন?'

শিকদারের কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য একটা চাপা উল্লাস।

রানা জানে, সত্যিই চাঁদ দেখতে পাবে সে। চাঁদের চেয়েও সুন্দর সোহানার অপূর্ব সুন্দর মুখটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে, লজ্জায় চোখ নিচু করে রেখেছে সোহানা, ঠোঁটের কোণে হাসি। স্বপ্নের মত কেমন অবাস্তব লাগছে ওর কাছে সবকিছু। ইন্টিমেটের গন্ধটা ভাল লাগছে ওর কাছে। সত্যিই কি সোহানার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল ওর? হলে কিন্তু মন্দ হত না।

মৃদু হেসে ধীরে ধীরে ঘোমটা তুলল রানা, বরফের মত জমে গেল পাঁচ সেকেণ্ড, পরমুহূর্তে আঁৎকে উঠে পিছিয়ে গেল দুই পা।

ভয়ঙ্কর একটা মুখ! মানুষের মুখকে যে সার্জিক্যাল নাইফের সাহায্যে এতখানি বীভৎস করা যায়, কল্পনাতেও ছিল না রানার। নাক নেই, চোখের পাতা নেই। দু'চোখের মাঝখানে, একটু নিচে নাকের হাড় দেখা যাচ্ছে, সেখানে শ্বাস নেয়ার জন্যে ছোট্ট দুটো ফুটো। ঠোঁট দুটো কেটে বাদ দেয়ায় সর্বক্ষণের জন্যে বেরিয়ে আছে দাঁত আর গোলাপী মাড়ি। দু'সারির সামনের দুটো দুটো চারটে দাঁত উপড়ে তুলে ফেলায় সৃষ্টি হয়েছে ভয়ঙ্কর এক চারকোণা গহ্বর, জিভ দেখা যাচ্ছে সেই ফাঁকে। কটমট করে চেয়ে আছে সোহানার পাতাহীন পাপড়িহীন দুই চোখ,

কোটরের লাল মাংস দেখা যাচ্ছে বলে পৈশাচিক মনে হচ্ছে দৃষ্টিটা। কোন দিন ঘুমে বা আদরে বুজে আসবে না এ চোখ আর। কোনদিন না।

রানার মনে হলো কেউ যেন তীক্ষ্ণধার একটা ছুরি বসিয়ে দিয়েছে ওর হৃৎপিণ্ডে। মরে গেছে সে। কোন বোধ নেই আর ওর মধ্যে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে ঘোমটা সরে যাওয়া বীভৎস মুখটার দিকে। আবছাভাবে কানে এল শিকদারের হাসি। উন্মাদের মত হাসছে শিকদার, হেসেই চলেছে।

ক্রমে ফিরে আসছে রানার বোধ। ধীরে ধীরে ফিরল শিকদারের দিকে। হাসি সংবরণ করল শিকদার। আনন্দে চক চক করছে চেহারাটা। বলল, 'উহ্, বিয়েতে খুব মজা করা গেল যা হোক। হাঃ হাঃ হা। কিন্তু বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বলুন কি দেখছেন? হাঃ হাঃ হাঃ হা। কই বলুন? বাসর ঘর তৈরি, আচার অনুষ্ঠান সেরে সেখানে আপনাদের পৌঁছে দিতে না পারলে কাজটা সম্পূর্ণ হয় না। হাঃ হাঃ হা। আচ্ছা, ধরে নেয়া যাক, কনের রূপ দেখে হতবাক হয়ে গেছেন দুলহা, মুখ দিয়ে কথা সরছে না। ঠিক আছে, কথা বলার দরকার নেই। কাজে দেখান। ওকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমো খেলেই আমরা বুঝব কনে পছন্দ হয়েছে আপনার। নিন এগোন। আর কোন আবদার নেই আমাদের, একটা চুমো খেলেই হবে। তারপর সারারাত ধরে চুটিয়ে মৌজ করুন, কেউ দেখতে আসবে না।'

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ভয়ঙ্কর একটা ক্রোধ বুকের ভিতর দানা বাঁধছে ওর। টনটন করছে বুকটা। কত দূর নিচে নামতে পারে, কতখানি জঘন্য, নারকীয় হতে পারে শিকদারের হীন প্রতিহিংসার রূপ, উপলব্ধি করতে পেরেছে সে। কোন রকম দয়া, মায়া বা মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নেই ওর মধ্যে। ভূত, প্রেত আর কুৎসিতের কাল্পনিক জগতে বিচরণ করতে করতে পিশাচ হয়ে গেছে লোকটা। বিষাক্ত গোক্ষুর মারতেও হয়তো বা রানার একটু দ্বিধা আসবে, কিন্তু প্রথম সুযোগেই একে নির্মম ভাবে হত্যা করতে একবিন্দু অনুশোচনা আসবে না ওর।

'কি হলো? পছন্দ হয়নি? বিয়ে হয়ে গেছে, এখন তো আর মত পরিবর্তন করা চলবে না, জনাব মাসুদ রানা।' একবার রানার মুখের দিকে, একবার সোহানার মুখের দিকে চাইল শিকদার, তারপর ফিরল গুলজারের দিকে। 'গুলজার, বোঝা যাচ্ছে, ঠিক ম্যাচ হয়নি জোড়াটা। মানাচ্ছে না। সোহানার জন্যে এমন বর দরকার যে হবে ঠিক ওরই মত সুন্দর, নিখুঁত। কি করা যায় বলো তো! এর একটা সুবিহিত করা দরকার।' মাথা ঝাঁকাল শিকদার, ফিরল রানার দিকে। 'ঠিক আছে। বুদ্ধি এসে গেছে মাথায়। পাঁচ মিনিটের মামলা। চলুন, জনাব মাসুদ রানা। আমার অপারেশন থিয়েটারে একটু তশরিফ আনতে আজ্ঞা হয়। সব কিছু তৈরি আছে সেখানে। আপনার সুন্দরী স্ত্রীর উপযুক্ত করে দেব আমি আপনাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

হাত দুটো মুঠি করল রানা। ঘামে পিচ্ছিল হয়ে গেছে হাতের তালু। দু'পা পিছিয়ে গেল সে। পরিষ্কার বুঝতে পারল শিকদারের উদ্দেশ্য। অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে সোহানার মতই ভয়ঙ্কর ভাবে বিকৃত করা হবে ওর চেহারাও। দুই

ভয়ঙ্করের মধ্যে বিয়ে দিয়ে নারকীয় উল্লাস উপভোগ করতে চায় শিকদার। ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল ওর কলজেটা যখন হুকুম দিল শিকদার, 'গুলজার! ধরো ওকে!'

গুলজার এক পা এগোতেই এক লাফে সরে গেল রানা কয়েক হাত তফাতে। হাসি ফুটে উঠল গুলজারের কদাকার মুখে। এই চার দেয়ালের বাইরে যাবার উপায় নেই রানার, জানে সে, তাই তাড়াহুড়োও নেই ওর মধ্যে। সামান্য একটু কুঁজো হয়ে দুই হাত সামনে বাড়িয়ে সাবধানে এগোল সে।

নড়ে উঠল সোহানা। চট করে চাইল শিকদার ওর দিকে। মুখে একগাল হাসি নিয়ে ডান হাতটা তুলল ওপরে। ধীর পায়ে রানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সোহানা।

'দাঁড়াও, গুলজার। কনে বোধহয় বরের চেহারাটা অন্য রকম হয়ে যাবার আগেই চুমো খেতে চায় একটা। ওকে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা আমাদের উচিত হবে না। আদর করো, মাসুদ রানা। তোমার প্রেয়সী, প্রাণের চেয়ে প্রিয়, বর্তমানে অর্ধাঙ্গিনী সোহানা চৌধুরী তোমার ভালবাসা চায়, বুকে নাও ওকে, সান্ত্বনা দাও চুমু খেয়ে।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে সোহানা। বীভৎস মুখটার দিকে চেয়ে রি রি করে উঠল রানার সারা শরীর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছিয়ে যাচ্ছে সে। নিজের অজান্তেই ঘৃণায় কুঁচকে গেছে ওর নাক। পৈশাচিক উল্লাসে হাসছে শিকদার। সরতে সরতে দেয়ালে গিয়ে ঠেকল রানা, এগিয়ে আসছে বিকট মূর্তিটা। বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। শিউরে উঠল রানা, নিজের প্রতিক্রিয়া নিজের আয়ত্তে রাখতে পারছে না, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল সে সোহানাকে, এমনি সময় শক্ত কিছু ঠেকল হাতে। চট করে চোখ নামাল রানা। বুঝতে পারল শিকদারের লাইব্রেরিতে কি করছিল সোহানা একটু আগে। রানার ওয়ালথার পিস্তলটা চুরি করে নিয়ে এসেছে সে ড্রয়ার থেকে।

পৈশাচিক আনন্দে দিশেহারা শিকদার কথা বলে চলেছে। 'বা-বা-বা-বা! চমৎকার! কী মর্মস্পর্শী দৃশ্য! আ-হাহা! কী অপূর্ব প্রেম! ধরো ওকে, রানা, বুকে নাও...'

থেমে গেল শিকদার। মিলিয়ে গেল মুখের হাসি। দেখতে দেখতে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল ওর চেহারাটা। ঝট করে রানার সামনে থেকে সরে গেছে সোহানা, পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে শিকদার রানার হাতে ধরা পিস্তল। ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা। কিন্তু তিন সেকেণ্ডেই সামলে নিল সে, চিৎকার করে উঠল, 'ধরো ওকে, গুলজার! ছিঁড়ে ফেলে দাও!'

ছোট্ট একটা হুঙ্কার দিয়েই একলাফে চলে গেল গুলজার পাথরের মূর্তির পেছনে, পরমুহূর্তে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা খড়গ হাতে। এক লাফে চলে এল ঘরের মাঝামাঝি। গুলি করল রানা। ক্লিক করে শব্দ হলো একটা, গুলি বেরোল না। দ্রুত হাতে স্লাইড টেনে আবার গুলি করল। তথৈবচ। ক্লিক!

অবাক চোখে সোহানার দিকে চাইল রানা। গুলি আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখেনি সোহানা? খালি পিস্তল ধরিয়ে দিয়েছে রানার হাতে! পিশাচ দ্বীপে এসে

এসপিয়োনাজ ট্রেনিং গুলিয়ে খেয়ে ফেলেছে!

আবার হিংস্র জানোয়ারের মত গর্জন করে উঠল গুলজার, এক লাফে কয়েক হাত এগিয়ে এসে চালাল খড়গটা। বিদ্যুৎগতিতে সরে গেল রানা। সাঁই করে মৃদু গুঞ্জন তুলে কানের পাশ দিয়ে চলে গেল ক্ষুরধার খড়গ। ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই দড়াম করে লাথি চালাল রানা গুলজারের দুই উরুর মাঝখানে। ঘোঁৎ করে একটা বিকট শব্দ বেরোল গুলজারের মুখ থেকে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে ওর ভয়ঙ্কর মুখটা। এক লাফে সরে গেল রানা যতদূর সম্ভব। টিপ দিল ম্যাগাজিন রিলিজ বাটনে। সড়াৎ করে বেরিয়ে মাটিতে পড়ল খালি ম্যাগাজিনটা।

মনে পড়েছে রানার, ওর প্যান্টের চোরা পকেটে রয়েছে একটা গুলি ভর্তি ম্যাগাজিন। কিন্তু ওটা বের করে পিস্তলে পুরবার সময় পাবে তো সে?

আবার খড়গ চালাল গুলজার। ঝপ করে বসে পড়ল রানা। খটাং করে দেয়ালে লাগল খড়গ, ঝুর ঝুর করে চুণসুরকি ঝরে পড়ল রানার মাথায়। দেয়াল ভেদ করে ঢুকে গেছে ওটা দুই ইঞ্চি। টেনে খসাবার আগেই গুলজারের পায়ের ফাঁক গলে ঘরের মাঝখানে চলে এল রানা।

'গুলি নেই, গুলজার!' চিৎকার করে উঠল শিকদার। 'গুলি নেই পিস্তলে। খালি হাতেই পারবে ওকে ধরতে।'

হ্যাঁচকা টানে দেয়াল থেকে খসে এসেছে খড়গটা। ততটা ধার আর নেই, কিন্তু যেটুকু আছে তা রানার ধড় থেকে মাথাটা খসিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এঁকেবেঁকে বাউলি কেটে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে রানা, ছুটোছুটি করছে ঘরময়, সাঁই সাঁই খড়গ চালাচ্ছে আর তেড়ে বেড়াচ্ছে গুলজার, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে হিংস্র জানোয়ারের মত, হাঁপাচ্ছে ফোঁস ফোঁস।

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা এবং গুলি করল।

বন্ধ ঘরে প্রচণ্ড শব্দ হলো গুলির। থমকে দাঁড়াল ধাবমান গুলজার। ওর বিস্ফারিত দুই চোখে অবিশ্বাস। মাথা নিচু করে দেখল নিজের বুকটা। কলকল করে রক্ত বেরোচ্ছে ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা ফুটো থেকে। মাথাটা সোজা করতে গিয়ে টলে উঠল একবার। তবু শেষ চেষ্টা করল। ধীরে ধীরে ডান হাতটা তুলল মাথার ওপর।

আবার গুলি করল রানা। পর পর দু'বার।

ঝন ঝন শব্দ তুলে মেঝের ওপর পড়ল খড়গটা, তার ঠিক দুই সেকেণ্ড পর ধড়াস করে পড়ল গুলজারের প্রকাণ্ড ধড়। কণ্ঠনালী দিয়ে ঢুকে সেভেন্থ ভারটেব্রা ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে গেছে তৃতীয় গুলিটা, দ্বিতীয় গুলি ছাতু করে দিয়েছে গুলজারের ডান হাতের কব্জি। ধীরে ধীরে ঘুরল রানা শিকদারের দিকে।

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছে শিকদার। দুই চোখে মৃত্যুভয়। দু'হাত তুলে আড়াল করবার চেষ্টা করছে নিজেকে।

'মেরো না! মেরো না! রানা, যা চাও তাই দেব আমি তোমাকে! যা চাও সব। বাবা গো···'

বাম হাতের তালু ফুটো করে দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রথম গুলিটা। রানার কঠোর

দৃষ্টিতে ঘৃণা। নির্মম, নিষ্ঠুর। ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল শিকদার। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী, অত্যাচারী সম্রাট যেন আজ রাজ্য হারিয়ে পথের ভিখারী। পথের ধুলায় মিশে গেছে শিকদারের ক্ষমতার দর্প। ধসে গেছে যেন একটা অটল, দৃঢ়, অনমনীয়, নিষ্ঠুর, গগনচুম্বী রাজপ্রাসাদ। কাকুতি-মিনতি করে কাঁদতে শুরু করল শিকদার। গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে।

'মেরো না। সব দেব। টাকা পয়সা, ধন দৌলত, যা চাও সব, শুধু প্রাণ ভিক্ষা চাই! সোহানা! সোহানাকে ফিরিয়ে দেব...'

দপ করে নিভে গেল লাইট।

রাত এগারোটা।

মস্ত ঘরটায় জ্বলছে শুধু চারটে মোমবাতি।

গুলি করা হলো না রানার। মৃদু পায়ের শব্দে পাঁই করে ফিরল পশ্চিমের সিঁড়ির দিকে।

কী ওটা!

শিরশির করে একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল রানার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে।

সেই ভ্যাম্পায়ারটা! শনিবার! প্রত্যেক শনিবার রাত এগারোটায় জেগে ওঠার কথা। আজ শনিবার!

সাপের মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে এসেছে শিকদার অনেকখানি, লক্ষ করেনি রানা। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে সে পশ্চিমের সিঁড়ির দিকে। এটাকেই যে কেমিক্যাল ভর্তি জারের মধ্যে দেখেছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ওর। এখনও টপ টপ করে কি যেন ঝরছে ওটার চুপসে যাওয়া বীভৎস গা থেকে। কেমন একটা ভয়ানক বোঁটকা গন্ধ। মাংস পচা। সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে সারাঘরে দৃষ্টি বোলাল জিনিসটা। গুলজারের ওপর গিয়ে স্থির হলো দৃষ্টি। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে খুশিতে। লোভে চকচক করছে চোখ দুটো। হেসে উঠল খনখনে গলায়। তারপর এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল মৃতদেহটার ওপর। স্পষ্ট দেখতে পেল রানা কুকুরের মত চাটছে ওটা গুলজারের বুকের কাছটায়, হাসছে খিল খিল করে।

নারীকণ্ঠের চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পেল রানা। ঝট করে পেছন ফিরল। শিকদারের ডান হাতটা উঠে গেছে মাথার ওপরে। অনর্গল কাকুতি-মিনতি করে চলেছে মুখে, কিন্তু রানার অসতর্কতার সুযোগে ছুরিও বের করে ফেলেছে একটা। বিদ্যুৎবেগে নেমে এল ছুরিটা, কিন্তু ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সোহানা। ঘ্যাচ করে বিঁধল ছুরিটা সোহানার পেটের কাছে। চট করে সেটা বের করে নিয়ে আবার চালিয়েছিল শিকদার, লাফ দিয়ে সরে গেল রানা। পিস্তলটা ধরল শিকদারের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে।

কিন্তু এবারও গুলি করা হলো না রানার।

স্বপ্ন দেখছে নাকি সে! নাকি মতিভ্রম? কি হয়েছে ওর!

পুবদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল সোহানা। উদ্বিগ্ন ওর চোখমুখ। বাঁ হাতে ভাঁজ করা অবস্থায় ঝুলছে রানার লাল স্ট্রাইপের হলুদ জ্যাকেটটা, ডান হাতে একটা টর্চ।

তাহলে এই মেয়েটা কে! পাঁই করে ঘুরল রানা এতক্ষণ যাকে সোহানা মনে করেছিল তার দিকে। এক নজর ওর দিকে চেয়েই বুঝতে পারল রানা, মারা গেছে মেয়েটা। শিথিল ভঙ্গিতে শুয়ে আছে মেঝের ওপর, চোখ দুটো কটমট করে চেয়ে রয়েছে রানার চোখের দিকে। স্থির।

শিকদারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা পাথরের মূর্তিটার পেছন থেকে। রানাকে অসতর্ক দেখে এক ছুটে মূর্তির আড়ালে চলে গেছে সে। গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ এল সোহানার উদ্দেশ্যে।

'মাসুদ রানা এবং আমার মাঝখানে এসে দাঁড়াও সোহানা! আমি ওপরে উঠে যাচ্ছি। যদি রানার পিস্তল থেকে গুলি বেরোয়, সেটা বুক পেতে নেবে তুমি।'

আশ্চর্য! এক লাফে সামনে এসে দাঁড়াল সোহানা! মূর্তির আড়াল থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল শিকদার। আর পাঁচ সেকেণ্ড দেরি করলে পালিয়ে যাবে। 'সরে দাঁড়াও, সোহানা! সরে দাঁড়াও!'

'না!'

সোহানাকে বাঁচিয়ে গুলি করবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু সম্মোহিত সোহানা বারবার ব্যর্থ করে দিল রানাকে। রানা যেদিকে সরে, সে-ও সেদিকে সরছে, কিছুতেই গুলি করতে দেবে না রানাকে। বার কয়েক ডাইনে বাঁয়ে সরেও যখন গুলি করতে পারল না, তখন বাম হাতে ঠেলে সামনে থেকে সরাবার চেষ্টা করল সোহানাকে। রানার পিস্তল ধরা হাত ধরে ঝুলে পড়ল সোহানা।

'আহ্, ছাড়ো সোহানা! হাত ছাড়ো!'

'না!'

শিকদারের হাসির আওয়াজ শুনতে পেল রানা ওপর থেকে। পর মুহূর্তে ভেসে এল গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'তোমাকে শায়েস্তা করছি আমি, মাসুদ রানা। দাঁড়াও!'

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

দশ

ঠিক যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল সোহানা। খানিকক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকের ওপর। ফুঁপিয়ে উঠল।

'রানা! রানা! বেঁচে আছ তুমি! আমি ভেবেছিলাম মেরে ফেলেছে তোমাকে, নয়তো বিকৃত করে দিয়েছে তোমার...' চট করে রানাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল সোহানা। দেখল গুলজার এবং বেনারসি পরা মেয়েটার মৃতদেহ।

'মরে গেছে?'

'হ্যাঁ। শিকদারও মরত তুমি বাধা না দিলে।' বলেই চট করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা গুলজারের মৃতদেহের দিকে। তেমনি নিচু গলায় খল খল করে হাসছে ভ্যাম্পায়ারটা, রক্ত চুষছে গুলজারের বুক থেকে ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে। হ্যালিউসিনেশন হচ্ছে নাকি ওর! সোহানা দেখতে পাচ্ছে না ওটা? কোন প্রতিক্রিয়া

নেই কেন সোহানার মধ্যে?

'আমি বাধা দিয়েছি! কখন?'

কোন উত্তর না দিয়ে পিস্তল তুলল রানা ভ্যাম্পায়ারটার দিকে। গুলি করল। লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল জিনিসটা বেত খাওয়া কুকুরের মত, রানার দিকে চেয়ে হাসল বীভৎস হাসি, তারপর আবার গুটি গুটি এগিয়ে গিয়ে মুখ লাগাল গুলজারের বুকে।

কাকে গুলি করা হলো বুঝতে না পেরে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল সোহানা রানার মুখের দিকে। রানার ঈষৎ বিস্ফারিত চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারল ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পাচ্ছে রানা। কিন্তু কি দেখছে?

'রানা! কাকে গুলি করলে? কি দেখছ অমন করে!'

চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রানা, 'তুমি দেখতে পাচ্ছ না?'

'কই না তো! কি দেখতে পাচ্ছি না? কি দেখছ তুমি?'

'যাদুঘরের সেই ভ্যাম্পায়ারটা! গুলজারের বুকের কাছে। পাচ্ছ না দেখতে?'

'কোথায়! না তো!'

রানার হাত ধরল সোহানা। আশ্চর্য! চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেল বিকট মূর্তিটা। বার কয়েক চোখ মিটমিট করল রানা। নাহ্, মিলিয়ে গেছে সেটা। হাত ধরে টেনে রানাকে ওর দিকে ফেরাল সোহানা।

'কি হয়েছে, রানা? অমন করছ কেন? হিপনোটাইজড্ হয়েছ?'

মাথা ঝাড়া দিল রানা। আবার একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল নেই সেটা। বলল, 'হতে পারে। খুব সম্ভব চোখের ভুল। চলো বেরিয়ে পড়ি এখান থেকে।' বেনারসি পরা মেয়েটার দিকে চাইল রানা। বলল, 'আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মারা গেল মেয়েটা।'

'চিনতে পেরেছ ওকে?'

'এখন পারছি। পূরবী। এখন বুঝতে পারছি, কেন মুখোশ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল ওর মুখ, কেন যেসব শব্দে প-ফ-ব-ভ-ম আছে সেগুলো উচ্চারণ করতে পারত না, কেন আত্মহত্যার চেষ্টা করত ও সারাক্ষণ।' সোহানার হাত থেকে ওর জ্যাকেটটা নিয়ে ভাঁজ করা অবস্থাতেই কাঁধে ফেলে পা বাড়াল রানা। বলল, 'তুমি এলে কি করে এখানে? জানতে এখানে কি হচ্ছে?'

'জানতাম। আমার মধ্যে নাকি সাইকিক-পাওয়ার আছে, তাই আমাকে ভবিষ্যতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রেখে পূরবীকে দিয়েই কাজ সারতে চেয়েছিল শিকদার। আমাকে আটকে রেখেছিল পুবদিকের একটা ঘরে।'

'বেরোলে কি করে?'

'পাহারায় ছিল উলফাত। পানি চাইলাম। ঘরে ঢুকতেই কাবু করে ফেললাম জুডোর প্যাঁচে। ওর কাছেই জানতে পারলাম তোমরা এখানে। বেচারা এখন শুয়ে আছে হাত-পা বাঁধা অবস্থায়...'

গুলজারের হাফপ্যান্টের বেল্টে গোঁজা চাবির গোছাটা একটানে বের করে নিল রানা নিচু হয়ে ঝুঁকে। তারপর এগিয়ে গেল পুব দিককার সিঁড়ির দিকে।

শেষবারের মত ঘরের চারদিকে চোখ বোলাতে গিয়ে হঠাৎ ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল সোহানা, খামচে ধরল রানার হাত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'কি হলো, সোহানা?'

'কি যেন দেখলাম, রানা! এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। মনে হলো যাদুঘরের সেই মড়াটাকে দেখলাম।'

'কোথায়?' চট করে গুলজারের মৃতদেহের দিকে চাইল রানা। কিছুই দেখতে পেল না।

'গুলজারের বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কি যেন করছে!' শিউরে উঠল সোহানা। 'চলো, পালাই এখান থেকে। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর অশুভ কিছু ঘটতে চলেছে আজ এই দ্বীপে!'

'চলো। তার আগে প্রতিশোধ নিতে হবে। খুব সম্ভব অবজারভেশন টাওয়ারে পাওয়া যাবে শিকদারকে।'

আলো জ্বলছে অবজারভেশন টাওয়ারে। মোমবাতির নরম আলো।

সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। চাপা কণ্ঠে বলল, 'তুমি এখানেই অপেক্ষা করো, সোহানা। আমি আসছি এখুনি। জ্যাকেটটা রাখো তোমার হাতে। আর ওই টর্চটা দাও।'

একহাতে টর্চ আর অন্যহাতে উদ্যত পিস্তল নিয়ে দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে উঠতে শুরু করল রানা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে। কাঠের মইটা লাগানো আছে দেখে বুঝতে পারল ওপরেই পাওয়া যাবে শিকদারকে। ছোরা ছাড়া আর কি অস্ত্র থাকতে পারে শিকদারের কাছে? যাই থাকুক, রক্ষা নেই আজ শিকদারের। লোকটাকে ধরে নিয়ে যাবে ঢাকায়, না মেরে রেখে যাবে? কোন্‌টা করবে?

সিঁড়ির শেষ মাথায় পৌঁছে থমকে দাঁড়াল রানা প্রকাণ্ড একটা ঘরের চৌকাঠের ওপর। খাঁ খাঁ করছে শূন্য ঘর। কেউ নেই ঘরে। ঠিক মাঝখানে, মেঝের ওপর সাদা রঙে আঁকা মস্ত একটা হেক্সাগ্রাম গোল করে ম্যাজিক সার্কেল দিয়ে ঘেরা। চারটে মোমবাতি জ্বলছে ম্যাজিক সার্কেলের উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিমে। ঘরের কোণে একটা ধূপ-দানি থেকে ধোঁয়া উঠছে অল্প অল্প। কি পোড়ানো হচ্ছে বুঝতে পারল না রানা, গন্ধটা উৎকট।

হেসে উঠল শিকদার। চমকে চারপাশে আবার চোখ বোলাল রানা। কেউ নেই ঘরে।

'আমি এই ঘরেই আছি,' বলল শিকদার। 'এসো, মাসুদ রানা। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। এসো দেখা যাক কে কত শক্তি ধরে।'

নিশ্চয়ই দেয়ালের গায়ে গুপ্ত দরজা আছে, তার ওপাশ থেকে কথা বলছে শিকদার, ভাবল রানা। পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে পা বাড়াল সামনে। দু'পা এগিয়েই বরফের মত জমে গেল ওর শরীরটা। পরিষ্কার বুঝতে পারল ভুল করে বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়েছে সে। মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে।

হিম-শীতল বাতাসের ঝাপটা লাগল চোখে মুখে। হঠাৎ কনকনে ঠাণ্ডা হিমেল

বাতাস বইতে শুরু করেছে উত্তর থেকে। ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে যাচ্ছে ওর শরীর। লক্ষ করল রানা মোমবাতির আলো কমে যাচ্ছে! চট করে টর্চটা জ্বালল। কিন্তু এ কী! টর্চের আলোও কমে যাচ্ছে! কমতে কমতে একেবারে কমে গেল ঘরের আলো, তারপর নিভে গেল সম্পূর্ণ। কিন্তু একেবারে অন্ধকার হলো না ঘরটা। ম্যাজিক সার্কেলের মাঝখানে একটা বেগুনী দ্যুতি। ধোঁয়ার মত কি যেন দেখা যাচ্ছে সেখানে। ঘূর্ণিধুলোর মত প্রচণ্ড বেগে পাক খাচ্ছে ধোঁয়াটা, ক্রমে ওপরে উঠছে। ঘন হচ্ছে।

বিশ্রী একটা পচা গন্ধ এল রানার নাকে। পচা লাশের দুর্গন্ধ। বমি ঠেলে উঠতে চাইছে রানার ভিতর থেকে, নাকটা কুঁচকে উঠতে চাইছে, কিন্তু সে ক্ষমতাও নেই এখন আর ওর। জমে গেছে সে বরফের মত। মনে হচ্ছে রক্ত চলাচল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে ওর। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে বেগুনী রংয়ের ধোঁয়াটে জিনিসটার দিকে। আট ফুট উঁচুতে মানুষের মুখের আকৃতি নিচ্ছে ঘন কুয়াশা। একটা চোখ দেখা যাচ্ছে এখন। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে চোখটা রানার চোখের দিকে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল মুখটা। ক্রমে ঘাড়, কাঁধ, বুক, পেট, কোমর, উরু স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

শিউরে উঠল রানা। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় চেয়ে রয়েছে সে ধোঁয়াটে মূর্তিটার দিকে। ভয়ে শুকিয়ে গেছে অন্তরাত্মা। সড় সড় করে খাড়া হয়ে যাচ্ছে ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো।

গুলজার!

জ্যান্ত হয়ে উঠছে গুলজার! একটু আগেই নিচে ওকে মেরে রেখে এসেছে রানা!

হঠাৎ লাল জ্যোতি বের হতে শুরু করল গুলজারের চোখ থেকে। সর্ব শরীর থরথর করে কাঁপছে রানার। চেষ্টা করল গুলজারের চোখ থেকে চোখ সরাতে, পারল না। মনে হচ্ছে শরীরটা হালকা হয়ে যাচ্ছে ওর। হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে শূন্যে ভেসে রয়েছে।

স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এসব অবাস্তব মনে হলেও আসলে সত্যি। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না। হেসে উড়িয়ে দেয়ার কথা মনে হলো না রানার একবারও। প্রাণ বাঁচানোর একটা আশ্চর্য আন্তরিক তাগিদ অনুভব করল সে অন্তরের অন্তস্তলে। কোরানের আয়াত হাতড়াচ্ছে এখন রানা মনে মনে। সেই ছোটকালে মৌলভীর বেতের ভয়ে শেখা সূরা-আয়াতের একটাও মনে আসছে না এখন দরকারের সময়। অনভ্যাসে চাপা পড়ে গেছে সব স্মৃতির অতলে। যা-ও মনে আসছে, দু'এক লাইন এগোলেই আটকে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে চারশো চল্লিশ ভোল্টের বিদ্যুৎ বয়ে যাচ্ছে শরীরের মধ্যে দিয়ে। শর্ট-সার্কিট করে দিচ্ছে ওকে ফিউজের তার জ্বালিয়ে দিয়ে। কেটে দিচ্ছে ঈশ্বরের সু-প্রভাবের স্রোত। ভুলে যাচ্ছে রানা পরের শব্দটা। প্রফেসার গোলাম জিলানীর একটা কথা মনে পড়ল রানার—প্রত্যেক পিশাচ-সাধকের নিজস্ব নাকি রিজিয়ন থাকে। সেখানে তারা সম্রাট।...ওর এলাকায় আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু। আমি কোন সাহায্য করতে পারব

না।

তবু হাল ছাড়ল না রানা। মনে মনে পরিষ্কার বাংলায় বলল, আল্লাহ্, তোমার সাহায্য দরকার। বাঁচাও।

আবছা ভাবে রানার কানে গেল একটা নারী কণ্ঠ। মনে হলো, বহু দূর থেকে, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে সোহানা ডাকছে ওকে নাম ধরে। মনে মনে আর্তনাদ করে উঠল রানা, কাছে এসো না সোহানা, দূরে থাকো, এখানে মহাবিপদ!

ভয়ঙ্কর শীত, কিন্তু রানা টের পাচ্ছে, ঘামছে সে। সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম ঝরছে ওর।

গুলজারের কণ্ঠে একটা চাপা গমগমে হাসি! চোখে তীব্র ঘৃণা। লাল রশ্মি বেরোচ্ছে চোখ থেকে।

বাম পা-টা বার কয়েক তড়াক তড়াক লাফাল টেনের নিচে সদ্য কাটা পড়া অঙ্গের মত। রানার বশে নেই সেটা আর। খিঁচুনির মত ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে ক্রমে ওপরে উঠছে বাম পা। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল রানার, সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্রিত করে লাফ দিয়ে সরে যেতে চাইল পেছনে, কিন্তু পারল না। অমোঘ এক আকর্ষণে টানছে মূর্তিটা ওকে ম্যাজিক সার্কেলের ভিতর। কিছুতেই এই আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারল না রানা, বোধশক্তিও লোপ পাচ্ছে দ্রুত, আচ্ছন্নের মত পা বাড়াল সামনে। এবার কাটা মুরগীর মত লাফাতে শুরু করল ডান পা-টা। ওপরে উঠছে ডান পা।

ঠিক এমনি সময় ঘরে এসে ঢুকল সোহানা। হাত রাখল রানার বাম বাহুতে।

মধ্যরাত্রির বুক চিরে দিয়ে ভয়ঙ্কর একটা আর্তনাদ করে উঠল গুলজারের ছায়ামূর্তি। যন্ত্রণা, ক্রোধ আর ভয় মেশানো চিৎকার। মনে হলো কেউ যেন আগুন থেকে তুলে লাল একটা লোহার শিক ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর শরীরে। মুহূর্তে ধোঁয়ায় পরিণত হলো গুলজার, প্রচণ্ড বেগে কয়েকটা ঘূর্ণিপাক খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ধোঁয়াটা রানার চোখের সামনে থেকে। টর্চ আর মোমবাতি জ্বলে উঠছে আবার। আবার নিভু নিভু হয়ে এল। দপ করে একবার জ্বলে উঠে আবার কিছুটা কমে গিয়ে শেষে জ্বলে উঠল পুরোপুরি। মনে হচ্ছে শুভ এবং অশুভ দুই শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছিল এতক্ষণ। অশুভকে পরাজিত করে প্রতিষ্ঠিত হলো শুভর জয়।

কনকনে ঠাণ্ডা হিমেল বাতাসটা থেমে গেছে আচমকা। চৈত্রের কাঠফাটা রোদে এয়ার কণ্ডিশনড্ ঘর থেকে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এলে যেমন লাগে, ঠিক তেমনি গরম লাগছে রানার এখন। শরীরটা এখনও কাঁপছে টেনে ছেড়ে দেয়া তানপুরার তারের মত।

'কী ওটা! রানা!' কেঁপে গেল সোহানার কণ্ঠস্বর।

কথা বলে নষ্ট করবার মত সময় নেই। সিঁড়ির কাছে সোহানাকে ঠেলে নিয়ে এল রানা। একটাই মাত্র চিন্তা কাজ করছে এখন ওর মাথায়—পালাতে হবে! এই অভিশপ্ত দ্বীপ থেকে পালিয়ে যেতে হবে যত শীঘ্রি সম্ভব। বুঝতে পেরেছে সে, কোন কারণে হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেছে শিকদারের জাদুর মায়াজাল, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার

করতে না পারলে নিস্তার নেই ওর হাত থেকে। পিস্তল এখানে খেলনার সামিল।

অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে নেমে আসছে ওরা সিঁড়ি বেয়ে, একেক বারে চার পাঁচ ধাপ করে ডিঙিয়ে প্রায় উড়ে নেমে যাচ্ছে। একবার পা পিছলালে একেবারে ছাতু হয়ে যাবে নিচে পড়ে, সে খেয়াল নেই। তীব্র আতঙ্কে বেপরোয়া, দিশেহারা হয়ে নামছে ওরা। কাঠের মইয়ের কাছে এসে অপেক্ষাকৃত মন্থর হলো গতি। ওপর থেকে ভেসে এল শিকদারের কণ্ঠস্বর।

'কতদূর যাবে, মাসুদ রানা? ওই মন্ত্র পড়া তাবিজ দিয়ে আমাকে তো দূরের কথা, একজন ম্যাজিস্টার টেম্পলিকে ঠেকানোই মুশকিল। আমি আছি ম্যাগাস স্তরে। আজ রাত বারোটায় উঠে যাব ইপসিসিমাস্ স্তরে। এর ওপরে নেই আর কিছু। কোন তাবিজেই কুলোবে না আর। বাধার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, তাই বেঁচে গেলে এ-যাত্রা। কিন্তু সারাটা রাত রয়েছে আমার হাতে। দেখি ঠেকাও কি দিয়ে।'

শেষের চার পাঁচটা ধাপ বাকি থাকতে পা পিছলে পড়ে গেল সোহানা। রানাও পড়ল ওর পাশে হুড়মুড় করে। আছড়ে-পাছড়ে উঠেই ছুটল ওরা দুর্গ তোরণের দিকে। আতঙ্কে বিস্ফারিত দুই জোড়া চোখ।

সেতু নামিয়ে দরজাটা খুলতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল রানা। চিতা বাঘটার কথা মনে পড়ে গেছে। মিনিট দুয়েক পরস্পরের দিকে চেয়ে হাঁপাল দু'জন। কারও মুখে কোন কথা নেই।

খুব সাবধানে, একেবারে নিঃশব্দে দরজার ভারি বল্টুটা খুলল রানা, সামান্য একটু ঠেলা দিয়ে চোখ রাখল দরজার ফাঁকে। নিকষ কালো অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না বাইরে। বাগানের ভয়ঙ্কর গাছপালার বিষাক্ত নিঃশ্বাসের গন্ধ এল নাকে।

ক্লিক করে টর্চ জ্বালল রানা। দপ করে জ্বলে উঠল দুটো চোখ। ঠিক চার হাত তফাতে এদিকে মুখ করে সেতুর ওপর বসে আছে চিতাটা। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল রানার। তাড়াহুড়োতে পিস্তল বের করে দরজার ফাঁকে ধরতে খড়মড় আওয়াজ হলো সামান্য, তড়াক করে এক লাফে বারো হাত তফাতে চলে গেল বাঘটা। গুলি করল রানা। প্রচণ্ড এক হুঙ্কার দিয়ে সেতুর ওপারে গিয়ে দাঁড়াল ওটা। আবার গুলি করল রানা। গুলি লাগল কিনা, কিংবা কোথায় লাগল বোঝা গেল না, কেঁউ করে একটা আর্তনাদ তুলে ছুটে চলে গেল বাঘটা বাম দিকে। মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

একটা মাত্র গুলি অবশিষ্ট আছে পিস্তলে। বাইরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ওঁৎ পেতে রয়েছে আহত বাঘ, যে কোন মুহূর্তে যে কোন দিক থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে ঘাড়ের ওপর। এই অবস্থায় বাইরে বেরোনো ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না রানা। এমনি সময়ে সমস্যার সমাধান করে দিল উলফাতের পৈশাচিক হাসি। কোন উপায়ে বাঁধন মুক্ত হয়ে নেমে আসছে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে। যা ঘটবার বাইরেই ঘটুক, দুর্গের ভিতর আর নতুন কোন ফ্যাসাদে জড়ানো ঠিক হবে না—ভাবল রানা। সোহানার হাত ধরে বিসমিল্লা বলে বেরিয়ে পড়ল বাইরে।

'যতক্ষণ পারো দম না নিয়ে থাকার চেষ্টা করো, সোহানা। এই বিষাক্ত গ্যাস শরীরের মধ্যে যত কম যায় ততই ভাল। নাও, দৌড় দাও। আমি পেছনে আছি।'

দৌড়ে চলেছে দু'জন। দৌড়াতে দৌড়াতেই চারপাশে টর্চের আলো ফেলে

মত প্রলাপ বকছে, 'তোমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব আমি, রানা!...তুমি আমার! একা আমার!...উহুহ্!' তোমাকে ছাড়া বাঁচব না আমি, রানা!' হু হু করে কেঁদে উঠল আবার।

সোহানার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে রানা। অদ্ভুত এক আবেগে টপ টপ করে জল ঝরছে ওর নিজের চোখ থেকেও।

বিশাল আকাশের নিচে, বিশাল সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে দু'জন মানুষ। বেঁচে আছে ওরা, সেটাই বড় কথা। দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে, অনুভব করতে পারছে। জীবন এক আশ্চর্য দুর্জ্ঞেয় রহস্য। ওই রহস্যময় তারা, তারও ওপারে অনাদি অনন্ত অসীম—তার চেয়েও অনেক অনেক রহস্যময় মানুষের প্রাণ, বোধ, চেতনা—এবং প্রেম।

এগোল ওরা।

খানিক এগিয়েই কাঁচা রাস্তা পাওয়া গেল একটা। চিনতে পারল সোহানা।

'আশ্চর্য! এখান থেকে আমার বাংলো কতক্ষণের পথ বলো তো?'

'সাড়ে-তিন ঘণ্টা।' ভেবে চিন্তে উত্তর দিল রানা।

'কচু! সাড়ে তিন মিনিট! এসো এইদিকে।'

জঙ্গল পেরিয়ে একটা টিলা, তার ওপাশে মস্ত এক টিলার মাথায় সোহানার বাংলো।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সোহানা।

'কি ব্যাপার! আলো কেন এত?'

প্রত্যেকটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঝলমল করছে বাংলোটা। চাওয়া যাচ্ছে না উজ্জ্বল আলোর দিকে।

'চলো, ওপরে উঠে দেখা যাক,' বলল রানা। পা বাড়াল সামনে।

আঁৎকে উঠল বাংলোর গার্ড রহম আলী ওদের দু'জনকে দেখে। যেন ভূত দেখছে : বড় বড় চোখ করে চেয়ে রয়েছে সে চুপচুপে ভেজা সোহানা ও রানার দিকে। ওরা এক পা সামনে বাড়তেই এক লাফে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। গলা দিয়ে গোঙানির মত একটা বিকট আওয়াজ বেরোল, তারপর হঠাৎ ঘুরেই দৌড় দিল বাংলোর ভিতরে।

অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চাইল রানা ও সোহানা। হাসল। তারপর পা বাড়াল ঘরের ভিতরে।

দড়াম করে খুলে গেল একটা দরজা। হুড়মুড় করে সেই দরজা দিয়ে বেরোলেন দুই বৃদ্ধ। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ। চট করে চশমাটা চোখ থেকে খুলে রুমাল দিয়ে মুছে আবার চোখে লাগালেন প্রফেসার গোলাম জিলানী। ছুটে এসে দু'জনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন মেজর জেনারেল। যেন হারিয়ে যাওয়া সাত রাজার ধন ফিরে পেয়েছেন আবার।

'কোথায় ছিলে তোমরা?'

'সোনাদিয়ায়।'

'এভাবে ভিজলে কি করে?'

'ডুবে গিয়েছিলাম, স্যার, সাগরে।'

দু'পা পিছিয়ে গেলেন মেজর জেনারেল ওদের ছেড়ে। বার কয়েক আপাদমস্তক দেখলেন ওদের। তারপর বললেন, 'জখম হওনি তো?'

'সামান্য, স্যার। একটা চিতা বাঘের খামচি খেয়েছি পিঠে।'

ঝট করে সোহানা ফিরল রানার দিকে। 'এতক্ষণ বলেননি কেন? খুলুন তো কোটটা দেখি কি রকম জখম?'

খামচির কথা শুনেই চট করে চাইলেন মেজর জেনারেল পাগলা প্রফেসারের দিকে। 'তুমি তো ঠিকই বলেছিলে, জিলানী! মিলে যাচ্ছে!'

'পরিষ্কার দেখেছি তো আমি! মিলবে না কেন? জিজ্ঞেস করে দেখো, কাল থেকে আজ পর্যন্ত যা যা বলেছি, সব মিলে যাবে। মান্নান, প্রকাণ্ড একটা খড়গ নিয়ে তাড়া করেছিল না তোমাকে একটা ভয়ঙ্কর লোক?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ইস্‌স্‌!' কুঁচকে গেল সোহানার গাল। 'চিরে ফাঁক হয়ে রয়েছে জায়গাটা!' চাপা গলায় বলল, 'তুমি মানুষ, না কি!' হাত ধরে টান দিল রানার। 'এক্ষুণি ফার্স্ট এইড দেয়া দরকার। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

'যাও, যাও, মোখলেস, যা করবার তাড়াতাড়ি সেরে জলদি ফিরে এসো এখানে। বিপদ কাটেনি এখনও। মহাবিপদ আসছে সামনে। আর হ্যাঁ, চট করে শুকনো কাপড় পরে নাও দু'জনেই। মাই ডিয়ার ব্রেভ ইয়ংম্যান, বিশ্রাম নেই আজ তোমার কপালে। জাগতে হবে সারারাত। যাও, জলদি এসো।' মেজর জেনারেলের দিকে ফিরলেন প্রফেসার, 'সৈনিক, তুমি এসো, পেন্টাকল্‌টা এঁকে ফেলা যাক। ওর নাম কি, ওই রিজিক আলীটা কোথায় গেল···'

ডেটল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে সার্জিকাল টেপ লাগিয়ে দিল সোহানা রানার পিঠে। এ. টি. এস. পুশ করল কোন আপত্তি গ্রাহ্য না করে। বাবার ওয়ারড্রোব থেকে বের করে দিল শুকনো জামাকাপড়, একটা নীল সার্জের স্যুট। ঠেলে ঢুকিয়ে দিল বাথরুমে। বলল, 'এ ঘরে কাপড় ছাড়ব আমি এখন। যতক্ষণ না ডাকব, বেরোবে না।'

দ্রুত হাতে ভেজা কাপড় ছাড়ল সোহানা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখল নিজের অনিন্দ্যসুন্দর শরীরের প্রতিচ্ছবি। সামনে থেকে দেখল, এপাশ ফিরে দেখল, ওপাশ ফিরে দেখল। রানার চোখে নিজেকে দেখার চেষ্টা করছে সে। কমলা রঙের শাড়িটার ভাঁজ খুলে বুকের কাছে ধরে চেয়ে রইল আয়নার দিকে। নাহ্‌, ভাল লাগছে না। ওটা রেখে দিয়ে নীলাম্বরি বের করল একটা। উঁহুঁ, পছন্দ হচ্ছে না এটাও। আরেকটা শাড়ি বের করতে যাবে, এমন সময় খুট করে শব্দ হলো বাথরুমের দরজায়। চমকে পিছনে ফিরল সোহানা।

দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। ফুল ড্রেস্‌ড্‌। ঠোঁটে মৃদু হাসি।

দু'হাতে চোখ ঢাকল হতবুদ্ধি সোহানা। হেসে উঠল রানা।

'এই থেকে প্রমাণ হয়, মেয়েমানুষের লজ্জা ওদের শরীরে নয়, চোখে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল সোহানার মুখটা। চট করে হাত সরাল চোখ থেকে। বলল, 'ও কথা মনে করিয়ে দিয়ো না, রানা। ভুলে যেতে চাই আমি দুঃস্বপ্নটা।'

রানার দৃষ্টিটা চট করে সোহানার ওপর থেকে সরে গেল সামান্য একটু বাঁয়ে, মনে হলো কি যেন দেখছে সে সোহানার পেছনে।

প্রায় উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহানা রানার বুকের ওপর। ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কি! কি দেখছ, রানা!'

দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল রানা। বলল, 'তোমাকেই দেখছিলাম। আয়নায়।'

কপট রাগে ভুরু কুঁচকাল সোহানা। কিল দিল রানার বুকে। এঁকেবেঁকে ছুটবার চেষ্টা করল রানার বাহু-বন্ধন থেকে। তারপর হাসল।

'অ্যাই, ছাড়ো! দেখে ফেলবে কেউ!'

'কি হবে দেখলে? সবাই সব জানে।' বলল রানা মৃদু হেসে।

'কি জানে!'

'সব।' আলতো করে ঠোঁটে একটা চুমো খেয়ে সোহানাকে ছেড়ে দিল রানা। 'মেজর জেনারেলকে সব বলে দিয়েছে পাগলা বুড়ো।'

কথাটা খেয়াল করতে পারেনি সোহানা। দ্রুত হাতে কাপড় পরতে পরতে হাল্কা ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কে বুড়োটা?'

'প্রফেসার গোলাম জিলানী।'

ভুরু জোড়া একটু কোঁচকাল সোহানা। 'কোন্ জিলানী? ফিলসফির সেই মহাপণ্ডিত ডক্টর জিলানী? হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির?'

'হ্যাঁ। চেনো নাকি তাঁকে?'

'চিনি না, কিন্তু জানি। এঁর বই পাঠ্য ছিল আমাদের কেমব্রিজে। কিন্তু উনি, উনি এখানে কেন?'

'আমাদের বুড়োর বাল্যবন্ধু। খুব সম্ভব পরশু রাতে আমার কাছ থেকে কোন মেসেজ না পেয়ে এঁকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছেন মেজর জেনারেল।'

'কেন?'

'শিকদারের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার জন্যে হয়তো। ঠিক জানি না। কাল থেকে এখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে দু'জন। বুড়ো জানে কক্সবাজারের কাছাকাছিই কোথাও আছি আমরা, কাজেই অনুমান করে নিয়েছে মুক্ত হতে পারলে প্রথমে এই বাড়িতেই আসব আমরা, এখানেই দেখা হবে আমাদের সঙ্গে। ব্যস, দখল করে নিয়েছে বাংলোটা। কাল থেকে সমানে আমাদের প্রতিটা কার্যকলাপের রানিং কমেন্ট্রি দিয়ে চলেছে পাগলা প্রফেসার।'

'সেটা কি করে সম্ভব?' রানার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সোহানা। 'হুকটা লাগিয়ে দাও তো?' আগের কথার খেই ধরল আবার। 'আমরা কোথায়, আর উনি কোথায়! রানিং কমেন্ট্রি দেবেন কি করে?'

'কি করে দেন তা জানি না। কিন্তু আমরা যখন তোমার রহস্যজনক নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে অন্ধকার হাতড়াচ্ছি, কোথায় আছ, কিভাবে আছ, কিছুই জানি না; তখন উনি বলেছিলেন, কুৎসিত আর কদাকারের রাজ্যে বন্দী হয়ে আছ তুমি,

চারদিকে অথৈ জল, মহাবিপদ তোমার মাথার ওপর।'

'তাই নাকি!' হালকা ভাবে পাউডারের পাফ বুলাচ্ছে সোহানা গালে, কপালে, গলায়। 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। নিজের কানেই তো শুনলে একটু আগে। উনি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছেন খড়্গ হাতে তাড়া করেছিল গুলজার আমাকে, ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আহত চিতাবাঘটা আমার ঘাড়ের ওপর, ঝড়ে পড়ে ডুবে গিয়েছিল আমাদের স্পীড বোট।'

ঝট করে ফিরল সোহানা রানার দিকে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে রানার মুখের দিকে।

'হায়, হায়! রানা! কাল রাতের ঘটনাটাও কি···! শিকদার যে অবস্থায় পেয়েছিল আমাদের···'

'হতে পারে।' হাসল রানা। 'কে জানে! হয়তো সবই বলে দিয়েছে বুড়ো অকপটে।'

'আল্-লা···!' আধ হাত জিভ কাটল সোহানা। বসে পড়ল খাটের কিনারে। 'আমি যেতে পারব না এখন ওদের সামনে। অসম্ভব।'

'তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল,' বলল রানা। 'বেশি দেরি করলে আবার কি ভেবে বসবে কে জানে!'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সোহানা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল দু'জন।

ড্রইংরুমের সামনে এসেই অবাক হয়ে গেল ওরা। ঢুকতে যাচ্ছিল, হাঁ হাঁ করে উঠলেন প্রফেসার জিলানী।

'অ্যাই, খবরদার! জুতো পায়ে এসো না। ধুয়ে মুছে সাফ করা হয়েছে ঘরটা। জুতো খুলে রাখো বাইরে।'

পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, সত্যিই ধুয়ে মুছে সাফ করা হয়েছে ঘরটা। টেবিল-চেয়ার, সোফা, কার্পেট, সব গুটিয়ে কিনারায় করা হয়েছে। বাস্ত সমস্ত হয়ে মেঝেতে কি যেন আঁক দিচ্ছেন প্রফেসার, আর একটা স্টীল টেপ দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আঁকগুলো মাপজোখ করাচ্ছেন মেজর জেনারেল। জুতো খুলে রেখে ঘরে ঢুকল ওরা।

'এসো মা, শাবানা,' কাজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন প্রফেসার। আঙুল তুলে ঘরের কোণে পরিষ্কার কাঠের মেঝে দেখিয়ে দিলেন। 'ওই ওখানটায় বসো তোমরা।'

নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়ল ওরা। দেখল ঘরের ঠিক মাঝখানটায় ষোলো ফুট ব্যাসের একটা চক্র আঁকা হয়েছে। একই কেন্দ্রবিন্দু থেকে আঁকা হয়েছে চোদ্দ ফুট ব্যাসের দ্বিতীয় চক্র। ভিতরের চক্রটার গা ছুঁয়ে আঁকা হয়েছে একটা পাঁচ-কোণী তারা। চক্র দুটোর মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় উদ্ভট কতগুলো শব্দ লিখে চলেছেন প্রফেসার রোমান হরফে—In nomina pa * tris et Fi * Lii et Spiritus * Sancti! * El * Elohym * Sother * Emmanuel * Sabaoth * Agia * Tetragrammaton * Agyos * Otheos * Ischiros —সেই সঙ্গে বিদঘুটে কতগুলো নকশা আঁকছেন পেন্টাকলের গায়ে একখানা পুরানো বই থেকে দেখে।

মাপজোখ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মেজর জেনারেল। 'ঠিকই আছে, ভুল নেই মাপে।'

'ভেরি গুড। আমারও আঁকাজোকা শেষ। এবার বাকি কাজগুলো সেরে ঢুকে পড়ব আমরা সবাই সার্কেলের ভেতর। রহিম আলীকে বিদায় দেয়া হয়েছে তো, এবার সব ক'টা জানালা দরজা বন্ধ করে দাও তুমি।' রানার দিকে ফিরলেন। 'মোস্তাক, এসো এদিকে। প্লীজ, হেল্প মি।'

লম্বালম্বি দুভাঁজ করা কম্বল যোগ চিহ্নের মত করে বিছাল রানা পেন্টাকলের মাঝখানে প্রফেসারের নির্দেশ অনুসারে। চারটে ভাঁজ করা চাদর বিছাল তার ওপর। তারপর চারটে বালিশ এমনভাবে রাখল যেন শুলে পরে প্রত্যেকের মাথা চক্রের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে থাকে, আর পাগুলো থাকে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে। খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করল রানা। তার মানে, ঠায় বসে বা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না সারা রাত, পিঠটা লাগাতে পারবে।

ঘরের কোণে রাখা একটা ছোট ব্যাগ থেকে পাঁচটা সাদা মোমবাতি বের করলেন প্রফেসার, এক এক করে জ্বেলে বিড় বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে বসিয়ে দিলেন তারাটার পাঁচ মাথায়। এরপর বেরোল পাঁচটা ছোট ছোট কাপ এবং এক বোতল মন্ত্রপূত গোলাপ-পানি। কাপগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ ভরা হলো বোতলের পানি দিয়ে, তারপর বসিয়ে দেয়া হলো পাঁচটি চূড়োর পাঁচটি উপত্যকায়। এবার ব্যাগ থেকে বেরোল পাঁচটা ঘোড়ার পায়ের নাল। মোমবাতিগুলোর পায়ের কাছে বসানো হলো ওগুলো বাইরের দিকে মুখ করে। কাপগুলোর পাশে রাখা হলো একটা করে ম্যানড্রেকের শুকনো শিকড়।

প্রত্যেকটা দরজা ও জানালার বল্টু পরীক্ষা করে বোতল থেকে পানির ছিটে দিলেন প্রফেসার ওগুলোর গায়ে, ঠোঁট দুটো নড়ছে অনবরত। লেজে গিঠ দেয়া দুটো করে রসুন আর একগাছি করে হিং-এর ঘাস বেঁধে দিলেন প্রত্যেকটা দরজা-জানালার কড়া ও বল্টুতে। তারপর হুকুম করলেন সবাইকে ম্যাজিক সার্কেলের ভিতর চলে আসতে। প্রত্যেকের বাঁ হাতে বাঁধা হলো হিং-এর ঘাস, কপালে লাগানো হলো বোতলের পানি। সার্কেলের ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা কাঁচের জগে পরিষ্কার খাবার পানি, একটা গ্লাস, একটা বড় পেয়ালায় আধসের মত চাল, ছোট ছোট দুটো পাত্রের একটায় কিছু লবণ, অন্যটায় পারা।

সবাই ভিতরে চলে আসতেই প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিলেন প্রফেসার।

'ব্যস। সকালে মোরগ ডেকে ওঠার আগ পর্যন্ত কেউ বেরোতে পারবে না এখান থেকে। বসে পড়ো সবাই। যথেষ্ট জায়গা আছে, যার খুশি শুয়ে পড়তে পারো। মোমিন থাকো আমার বাঁয়ে, তার বাঁয়ে সালেহা, তার বাঁয়ে সৈনিক, তার বাঁয়ে আমি।'

শুয়ে পড়ল রানা। বলল, 'কিন্তু এতসব আয়োজন কিসের জন্যে ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবে তুমি, মজিদ। তার আগে আমার দুই একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি। এর মধ্যে কখনও ওই পিশাচটাকে বলতে শুনেছ, ওর পাপ

সাধনায় ঠিক কোন স্তরে উঠেছে ও?'

'বলেছিল। কিন্তু কি বলছে বুঝতে পারিনি। আমরা পালিয়ে আসার সময় কি কি সব উদ্ভট কথা বলে শাসাচ্ছিল আমাদের। আমরা নাকি কোন এক তাবিজের জোরে বেঁচে গেলাম সে যাত্রা, কিন্তু তাবিজ দিয়ে ঠেকানো যাবে না ওকে, এইসব আজেবাজে কথা। অথচ কোন তাবিজ-টাবিজ ছিল না আমার কাছে।'

'ছিল। তোমার একটা জ্যাকেটের কলারের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল ওটা। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ঠিক কি বলেছিল লোকটা তোমাকে? আমার পরিষ্কার একটা ধারণা থাকা দরকার প্রতিপক্ষের ক্ষমতা সম্পর্কে।' অভ্যাস বশে নস্যির কৌটো বের করতে গিয়ে থমকে গিয়ে খালি হাত বের করে আনলেন পকেট থেকে। বলে চললেন, 'আমার ধারণা ছিল লোকটা প্র্যাকটিকাস স্তরে আছে, কিন্তু ওর কর্ম-কাণ্ডের কিছু নমুনা দেখে বেশ ঘাবড়ে যাচ্ছি, মনে হয় আরও ওপরের কোন স্তরে...'

হঠাৎ কথা বলে উঠল সোহানা। 'উহুঁ। প্র্যাকটিকাস বলে কোন শব্দ উচ্চারণ করেনি শিকদার। ইপসি না ইবসিসি কি যেন বলেছিল ও।'

শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন প্রফেসার, তড়াক করে উঠে বসলেন কথাটা শুনে।

'মাই গড! বলো কি! ইপসিসিমাস?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বলে উঠল রানা। 'বলেছিল ম্যাগাস স্তরে আছে ও, রাত বারোটার পর উঠে যাবে ইপসিসিমাস স্তরে।'

'সর্বনাশ!' বিস্ফারিত চোখে চাইলেন প্রফেসার মেজর জেনারেলের দিকে। 'ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। ইপসিসিমাসকে ঠেকাতে হলে আরও কিছু উপকরণ দরকার। ব্যাগের মধ্যে রয়ে গেছে ওগুলো।' ঘরের কোণে রাখা ব্যাগটার দিকে চাইলেন হতাশ দৃষ্টিতে। 'ইসস্! কী গ্রস্ আণ্ডার-এস্টিমেশন!'

'আমি এনে দিচ্ছি,' বলে উঠতে যাচ্ছিল রানা।

খপ করে ধরে ফেললেন ওকে পাগলা প্রফেসার। 'এখন আর আনা যাবে না। সার্কেল থেকে বেরোনো যাবে না আর। মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।' নিদারুণ ক্ষোভ ফুটে উঠল ওঁর কণ্ঠস্বরে।

'পিস্তল আছে আমার কাছে জিলানী,' সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন মেজর জেনারেল, 'তুমি ভেব না কিছু।'

দুঃখের হাসি হাসলেন প্রফেসার, কোন উত্তর দিলেন না। শুয়ে পড়লেন চুপচাপ।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রানা বলল, 'ঠিক কি ধরনের আক্রমণ আশা করছেন?'

আবার ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন প্রফেসার। 'ও, হ্যাঁ। সেটাই তো তোমাদের জানানো হয়নি। বলছি, মন দিয়ে শোনো।'

খানিক চুপ করে থেকে মনে মনে গুছিয়ে নিলেন প্রফেসার ওঁর বক্তব্য।

'আসলে ঠিক কি যে ঘটতে চলছে সে সম্পর্কে আমার নিজেরও পরিষ্কার কোন ধারণা নেই। হয়তো কিছুই না-ও ঘটতে পারে। হয়তো শুধু শুধু রাত জাগাই সার

হবে আমাদের। কিন্তু আমার বিশ্বাস, লোকটা প্রতিশোধ যখন নেবে বলেছে, তখন চেষ্টার ত্রুটি করবে না। সর্বশক্তি নিয়োগ করবে সে আজ। কারণ, কথার খেলাপ হলে ওর এত দিনকার অর্জিত সমস্ত ক্ষমতা হারাবে ও আজ রাতে। তাই সব দিক থেকে আক্রমণ চালাবে ও আজ আমাদের ওপর। পাঠাবে ওর আজ্ঞাবহ ভয়ঙ্করতম পিশাচ।

'কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে, যত যাই পাঠাক না কেন, যতক্ষণ আমরা এই পেন্টাকলের মধ্যে থাকছি, কারও ক্ষমতা নেই আমাদের কোন রকম ক্ষতি করে। পেন্টাকলের মধ্যে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট সেফ। কিন্তু আমাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি এক পা বাইরে বের করে, মুহূর্তে শেষ হয়ে যাব আমরা সবাই।

'হয়তো চোখের সামনে ভয়ঙ্কর, বিকট, বীভৎস দৃশ্য দেখতে পাবে, এমন সব দৃশ্য যা কোন দিন কোন দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে যেতে চাইবে চোখ, কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতে পারে প্রচণ্ড, ভয়াবহ শব্দে—কিন্তু কোন ক্ষতি হবে না আমাদের, যতক্ষণ এই দাগের বাইরে না যাই। মনে রেখো, দাগের বাইরে বের করার চেষ্টা চালানো হবে প্রতিপক্ষের তরফ থেকে, যত ভাবে সম্ভব।

'আবার, ভয় না দেখিয়ে কৌশলের আশ্রয় নেয়াও বিচিত্র নয়। হয়তো কিছুই দেখব না, কিছুই শুনব না, নিজের অজান্তেই নিজের ভেতর গোলমাল বেধে যাবে। হয়তো নানান রকম যুক্তি-তর্ক আসতে শুরু করবে মাথার মধ্যে, মনে হবে খামোকা ভয় পাচ্ছি, এইসব নিম্নশ্রেণীর কুসংস্কারকে পাত্তা দেয়াটা নেহায়েত গাধামি হচ্ছে, এই অস্বস্তিকর পরিবেশে শক্ত কাঠের ওপর শুয়ে-বসে বেহুদা কষ্ট করার চেয়ে ঘরে গিয়ে নরম বিছানায় ঘুমিয়ে পড়া অনেক ভাল। যদি এরকম কিছু ঘটে, বুঝতে হবে সেটা প্রতিপক্ষের ধোঁকাবাজি। আমি নিজেও মত পরিবর্তন করে বসতে পারি। হয়তো হঠাৎ বলে বসব, আরেকটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়, এই পেন্টাকলের চেয়েও নিরাপদ ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি আমি সবার জন্যে। বিশ্বাস কোরো না। এর চেয়ে নিরাপদ আর কোন ব্যবস্থা নেই। প্রয়োজন মনে করলে বল প্রয়োগ করবে, কিন্তু কিছুতেই বাইরে বেরোতে দেবে না আমাকে।'

নাক চুলকালেন প্রফেসার, তারপর শুরু করলেন আবার।

'ভয়ানক পানি পিপাসা লাগতে পারে, কিংবা খিদে লাগতে পারে—সেসবের জন্যে এক বাটি চাল আর জগে পানি রয়েছে। হয়তো হঠাৎ কানে ব্যথা উঠতে পারে, কিংবা শরীরের আর কোথাও তীব্র ব্যথা—সহ্য করতে হবে; পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেরে যাবে ব্যথা। এসব আর কিছু না, পেন্টাকল থেকে বাইরে বের করবার ফন্দি।

'আক্রমণ আসবে কিনা, এলে ঠিক কোন দিক থেকে কিভাবে আসবে তা বলা যায় না। যখন আসবে তখন আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ টের পাবই। প্রতিরোধের জন্য দুটো অস্ত্র রয়েছে আমাদের হাতে—প্রথম, ব্লু ভাইব্রেশন। চোখ বুজে কল্পনা করবে তোমার চারপাশে নীল আলো, নীলের মধ্যে ডুবে আছ তুমি। দ্বিতীয়, প্রার্থনা। লম্বা চওড়া কঠিন কোন প্রার্থনা উচ্চারণ করতে যেয়ো না, গুলিয়ে

ফেলবে সব। প্রভু, খোদা, আল্লাহ যে নামেই ডাকো না কেন, ঈশ্বরকে ডেকে বলবে, রক্ষা করো। বার বার বলতে থাকবে কথাটা। বুঝেছ?

'সব কথার সার কথা হলো কিছু ঘটুক আর না ঘটুক, কোন অবস্থাতেই দাগের বাইরে যাব না আমরা আজ রাতে। সবাই রাজি?'

রাজি হলো সবাই।

রাত দেড়টা। চুপচাপ শুয়ে আছে চারজন। ভিতরের কোন ঘর থেকে টিক টিক শব্দ আসছে দেয়াল ঘড়ির। ধীরে ধীরে প্রচণ্ড একটা নিস্তব্ধতা গ্রাস করল ওদের। প্রতীক্ষা করছে ওরা। সজাগ। সতর্ক।

উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে ঘরের ভিতর।

বাইরে রহস্যময় নিকষ কালো অমাবস্যা।

তেরো

সময় যেন নড়তেই চায় না।

একঘন্টা পার হয়ে গেছে, কিন্তু আক্রমণের কোন নমুনা দেখা গেল না।

ঘুম নেই কারও চোখে। ষাটটি মিনিট ওদের কাছে মনে হলো ষাট ঘন্টা। চোখ বুজে পড়ে আছে চারজন। কারও মুখে কথা নেই। যার যার নিজস্ব ভাবনায় ডুবে আছে সবাই।

একঘন্টা নীরব প্রতীক্ষার পর কেমন যেন উদ্ভট লাগলে রানার কাছে সবকিছু। মনে হচ্ছে ছোট বেলার সেই ভয় ভয় খেলা খেলছে ওরা চারজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে যে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সে, স্থান, কাল ও পাত্র পরিবর্তনের পর দ্রুত হালকা হয়ে আসছে তার স্মৃতি। ভয়াবহতা হারিয়ে হালকা হয়ে গেছে সব, কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন লাগছে পিশাচ দ্বীপ থেকে বেরিয়ে বাইরে স্বাভাবিক জগতে পরিচিত লোকজনের মধ্যে ফিরে এসে।

নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে সোহানার। ওরই জন্যে সবার এই কষ্ট। ওকেই রক্ষা করবার জন্যে ছুটে এসেছে রানা ঢাকা থেকে বিপদ বাধা তুচ্ছ করে, ছুটে এসেছেন দুই বৃদ্ধ। অথচ এই মহৎপ্রাণ মানুষগুলোর স্নেহ-ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা ওর কোথায়? ওর মত একটা তুচ্ছ মেয়ের জন্যে এত করছে এরা, ও নিজে কি করেছে এদের জন্যে? কিছুই কি করবার নেই ওর? এমন কিছুই নেই যা দিয়ে এদের কষ্ট লাঘব করা যায়?

মেজর জেনারেল রাহাত খান পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, কিছুই ঘটবে না আজ রাতে। আরও তিন-তিনটে ঘন্টা শুধু শুধু কষ্ট করাই সার হবে। সজ্ঞান অবস্থায় ষাটটি বছর কাটিয়েছেন তিনি এই পৃথিবীতে। কোনদিন আধিভৌতিক কিছু দেখার সৌভাগ্য হয়নি ওঁর। আজও হবে না। দুর্বল মুহূর্তে উদ্বেগ চেপে রাখতে পারেননি তিনি প্রফেসার জিলানীর কাছে, বলে ফেলেছিলেন সোহানার হারিয়ে যাওয়ার কথা—তারই জের টানতে হচ্ছে এখনও। প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস ছিল না ওঁর

কোনদিনই। সম্মোহন বা বড় জোর টেলিপ্যাথী পর্যন্ত মেনে নেয়া যায়, কিন্তু ভূতপ্রেতের আক্রমণ হতে পারে, আত্মরক্ষার জন্যে ম্যাজিক সার্কেল এঁকে তার মধ্যে বসে থাকতে হবে, এসব যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি হাস্যকর। মহা লজ্জার ব্যাপার হবে যদি সারারাত অপেক্ষা করে দেখা যায় কিছুই ঘটল না, সব বাজে। কথাটা প্রকাশ হয়ে গেলে মানুষের কাছে মুখ দেখানোই মুশকিল হয়ে যাবে। আপত্তি তোলার চেষ্টা করেছিলেন তিনি এক-আধবার, কিন্তু গায়ে মাখেনি প্রফেসার। যদিও বন্ধু, তবু এত বড় পণ্ডিতকে হেসে উড়িয়ে দিতে বেধেছে ওঁর। বিশেষ করে যখন বুঝতে পেরেছেন প্রত্যেকটি কথা অন্তর থেকে বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করছেন প্রফেসার। আচ্ছা, মাথায় কোন দোষ হয়নি তো জিলানীর?

স্থির হয়ে শবাসনে শুয়ে আছেন ডক্টর জিলানী। খুব ধীরে ওঠা-নামা করছে বুক। দেখলে মনে হবে ঘুমে বিভোর হয়ে আছেন, কিন্তু আসলে সঙ্গী তিনজনের সামান্যতম নড়াচড়াও খেয়াল করছেন উনি, বাইরের মৃদু বাতাসে গাছের পাতার আবছা খসখস শব্দও এড়াচ্ছে না ওঁর সজাগ কান। কিছুমাত্র বিরক্তি নেই সার্বক্ষণিক ওঁর এই সতর্ক প্রতীক্ষায়।

সময় আর এগোতে চায় না। ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠছেন মেজর জেনারেল। যতই ভাবছেন ততই রেগে উঠছেন তিনি নিজেরই ওপর। প্রফেসারের ব্যস্ততা আর তাড়াহুড়োয় কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি প্রথম দিকে, রিপোর্ট নেয়া হয়নি রানার কাছ থেকে। শিকদারের আসল মতলবটা কি, কোনরকম বিদেশী স্পাইচক্রের সঙ্গে ব্যাপারটা জড়িত কিনা, কি দেখল রানা ওখানে, কিছুই শোনা হয়নি। জুজুর ভয় দেখিয়ে কতগুলো অর্থহীন দাগের ভেতর ভরে দিয়ে খামোকা মূল্যবান সময় নষ্ট করছে প্রফেসার। এক্ষুণি ওয়্যারলেসে সংবাদ দেয়া দরকার ঢাকায়, অ্যারেস্ট করা দরকার শিকদার ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের, অথচ···। নাহ্! দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কাজ হচ্ছে। তড়াক করে উঠে বসলেন তিনি।

'দেখো, জিলানী, এইসব ছেলেখেলার কোন মানে হয় না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কিছুই ঘটবে না আজ রাতে। শুধু শুধু সময় নষ্ট না করে এবার কিছু সত্যিকার কাজ করা দরকার। ঢাকায় একটা সংবাদ দিয়ে তারপর তোমার এই আঁকজোকের মধ্যে সারারাত বোকার মত বসে থাকায় আমার আপত্তি নেই। আমি চললাম।'

উঠে দাঁড়ালেন মেজর জেনারেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসার।

'খুব বোকামি মনে হচ্ছে তোমার কাছে এসব, তাই না, সৈনিক?'

'হ্যাঁ।' সোজা মুখের ওপর বলে দিলেন মেজর জেনারেল। 'এখুনি বলবে, তাহলে পেন্টাকলের মধ্যে সারা রাত থাকতে রাজি হয়েছিলাম কেন?'

'না, তা বলব না। শুধু একটা প্রশ্ন করব—তুমি চাও যে আমরা তিনজন মারা যাই?'

'তা কেন চাইব? কিন্তু আমি জানি, এসব মিথ্যে ভয়। মিছেমিছিই ভয় পাচ্ছ তুমি। তোমার কাল্পনিক আতঙ্ক তিন তিনজন মানুষকে অনর্থক জাগিয়ে রেখে কষ্ট দিচ্ছে, সেটা ভেবে দেখছ না তুমি, জিলানী।'

মেজর জেনারেলের কাঁধে একটা হাত রাখলেন প্রফেসার জিলানী। 'হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু আমি তোমার বহুদিনের পুরানো বন্ধু। আমার জন্যে তুমি এর চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করেছ আগে বহুবার। আজকের কষ্টটা কি সেই বন্ধুত্বে ফাটল ধরিয়ে দেবে?'

'না, না। তা কেন হবে?' একটু যেন বিব্রত মনে হলো মেজর জেনারেলের কণ্ঠস্বর।

'তাহলে বন্ধুত্বের দাবিতে যদি একটা অনুরোধ করি আমি, রাখবে না তুমি?'

'সম্ভব হলে নিশ্চয়ই রাখব।'

রানা বুঝতে পারল মেজর জেনারেলের মধ্যে হঠাৎ যে সব যুক্তি-তর্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, পরাজিত হতে যাচ্ছে সেগুলো।

'থ্যাংক ইউ, রাহাত। ধরে নেয়া যাক ব্ল্যাক-ম্যাজিক বা পিশাচ-সাধনা একটা বালখিল্য কুসংস্কার। কিন্তু যেহেতু আমি এসব ব্যাপারকে দারুণ ভয় পাই, আমি আমার বন্ধুকে অনুরোধ করছি আজকের রাতটা এই চক্রের ভেতর আমাদের সঙ্গে থাকতে। থাকবে না?'

কাঁধ শ্রাগ করলেন মেজর জেনারেল। তারপর লজ্জিত হাসি হাসলেন।

'একথা বললে আমার আর কোন উপায় থাকে না। ঠিক আছে। কিন্তু দেখো, ভূত-প্রেতের টিকিও দেখতে পাবে না আজ সারারাতে।' বসে পড়তে পড়তে বললেন, 'যাই হোক, পিছিয়ে দিলে আমাদেরকে কয়েক ঘণ্টা।'

'বড় জোর তিন ঘণ্টা?' মৃদু হাসলেন প্রফেসার। 'তিন ঘণ্টা পর এজন্যে কোন দুঃখ থাকবে না তোমার, সৈনিক।'

'তার মানে?'

'ধৈর্য ধরো। টিকির দেখা পাওয়া গেছে। আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।'

আবার শুয়ে পড়ল সবাই। নিস্তব্ধতা নামল ঘরের ভিতর। বয়ে চলেছে সময়।

কই? কিছুই তো ঘটছে না। রানার মনে হলো, ঠিকই বলেছেন মেজর জেনারেল। খামোকা কষ্ট করছে ওরা। সবটা ব্যাপার হাস্যকর মনে হচ্ছে ওর কাছে। এভাবে চুপচাপ মটকা মেরে পড়ে থাকা যায় না। অস্বস্তি লাগছে, বোকা বোকা লাগছে। আস্তে করে ঘাড় কাত করে চাইল সে সোহানার দিকে। চিত হয়ে শুয়ে আছে সোহানা। চোখ বন্ধ। দুষ্টুমী বুদ্ধি খেলল রানার মাথায়। কুট করে চিমটি কাটল ওর পেটে।

তড়াক করে উঠে বসল সোহানা। তারপর রানাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে হেসে উঠল উচ্চ কণ্ঠে।

'কি হলো! কি হলো, সোহানা?'

একসঙ্গে উঠে বসেছেন মেজর জেনারেল এবং প্রফেসার। অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে হেসেই চলেছে সোহানা। অবাক চোখে চেয়ে রয়েছেন ওঁরা ওর মুখের দিকে।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন আবার মেজর জেনারেল।

'হি হি হি হি হি হি। ও না, আমাকে··· হি হি হি হি হি হি হি! আমাকে না, ··· হি হি হি হি হি হি।' পেট চেপে ধরে কাঁপছে সোহানা হাসির দমকে, বাঁকা হয়ে গেছে সামনের দিকে। বেহায়ার মত হেসে চলেছে অনর্গল। হঠাৎ কাশতে শুরু করল। কাশছে তো কাশছেই।

চট করে রাহাত খানের চোখের দিকে চাইলেন প্রফেসার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। তারপর জগ থেকে পানি ঢাললেন গ্লাসে, বোতল থেকে কয়েক ফোঁটা পানি মেশালেন তাতে।

'এটুকু খেয়ে নাও তো, সালিমা। ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। কেশে চলেছে সে অনবরত। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠেসে ধরে রাখলেন ওকে মেজর জেনারেল। কাশির ফাঁকে কোনমতে বলল সোহানা, 'ওষুধ! খক, খক, খক! ওই ঘরে কাশির ওষুধ। খক, খক, খক, খক···'

রওনা হতে যাচ্ছিল রানা, খামচে ধরলেন প্রফেসার ওর কোটের হাতা।

'খবরদার। এক পা বেরোবে না বাইরে। ধরো ওকে, পানিটুকু খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

খানিকটা পানি হাতের তালুতে নিয়ে সোহানার চাঁদিতে কয়েকটা মৃদু চাপড় দিলেন বৃদ্ধ। আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল কাশি। গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে ধরতেই ঢক ঢক করে সবটুকু খেয়ে ফেলল সোহানা। সবার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চাইল বোকার মত। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'কিচ্ছু হয়নি। পিপাসা লেগেছিল, পানি খেলে। শুয়ে পড়ো এবার।'

শুয়ে পড়ল সোহানা।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন প্রফেসার একবার রানা এবং মেজর জেনারেলের চোখের দিকে। রানা বুঝতে পারল, এটা ছিল প্রতিপক্ষের দ্বিতীয় আক্রমণ। রাহাত খানও বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা। কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছেন তিনি।

আবার শুয়ে পড়ল রানা। এক মিনিট, দুই মিনিট করে পার হয়ে গেল দশ মিনিট।

সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন অনুভব করল রানা ঘরের ভিতর। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে আকৃতিহীন কি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে আশপাশে। নিঃশব্দে। অদৃশ্য একটা শক্তি যেন ঘুরছে পেন্টাকলের চারপাশে। খুঁজছে কোন ত্রুটি বা খুঁত পাওয়া যায় কিনা, যেখান দিয়ে ভেতরে ঢোকার পথ করে নেয়া সম্ভব হতে পারে। স্পষ্ট অনুভব করল রানা, পথ পেল না সেটা; পিছিয়ে গেল, কিন্তু চলে গেল না ঘর ছেড়ে। থম থম করছে ঘরটা ওর উপস্থিতিতে।

হঠাৎ ঘরের বাইরে চি-চি করে ডেকে উঠল কয়েকটা ছুঁচো। খুব সম্ভব এ বাড়িরই বাসিন্দা। খোলা দরজাটা হঠাৎ আজ বন্ধ দেখে আঁচড়াতে শুরু করল দরজার গায়ে। নিস্তব্ধ ঘরের ভিতর অত্যন্ত জোরে শোনা যাচ্ছে শব্দটা। রানার বাম হাত চেপে ধরল সোহানা। খানিকক্ষণ আঁচড়ে কামড়ে সুবিধা করতে না পেরে

হালকা পা ফেলে চলে গেল ওগুলো। বার কয়েক প্যাঁচা ডেকে উঠল, তারপর আবার সব চুপ। অদ্ভুত রোমাঞ্চকর একটা নিস্তব্ধতা। পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছে রানা আশপাশেই রয়েছে ভয়ানক ক্ষমতাশালী একটা শক্তি, উপযুক্ত মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছে, প্রথম সুযোগেই আঘাত হানবে বিদ্যুৎবেগে।

কুট করে একটা মশা কামড় দিল সোহানার পায়ে। লাফ দিয়ে উঠে বসল সোহানা। সঙ্গে সঙ্গেই ফড়ফড় করে দু'তিনটে আরশোলা উড়ে এসে বসল ওর জামাকাপড়ে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সোহানা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ভয়ে, ঘেন্নায়। পাগলের মত কাপড় ঝাড়ছে সে। নিজের অজান্তেই দাগের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল সোহানা, খপ করে ধরে ফেললেন ওকে মেজর জেনারেল। ততক্ষণে আবার উড়াল দিয়েছে আরশোলাগুলো, দরজার গায়ে গিয়ে বসল, তারপর ফাঁক গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরবর্তী পঁচিশ-ত্রিশ মিনিট কোন রকম সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না প্রতিপক্ষের। মিনিট দশেক উঠে বসেছিল সবাই আরও কোন আক্রমণের আশঙ্কায়, আবার শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ রানার মনে হলো, আচ্ছা, বাতাসের সঙ্গে তলোয়ার ঘুরিয়ে মক-ফাইট করছে না তো ওরা? এসব সত্যিই কোন অশুভ শক্তির চাল, না কি ওদের নিজেদেরই কল্পনার সৃষ্টি? সরাসরি আক্রমণ করছে না কেন শিকদার? কথাটা ভাবতে ভাবতে চোখ মেলল রানা, এবং যা দেখল তাতে শিরশির করে খাড়া হয়ে গেল ওর গায়ের পশম।

কমে যাচ্ছে বালবের আলো! খুব ধীরে, কিন্তু কমে যাচ্ছে ক্রমেই!

চোখ বুজে থাকলেও রানার প্রতিক্রিয়া টের পেলেন প্রফেসার। চট করে চোখ মেললেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলেন কেন হঠাৎ চমকে উঠল ব্রেভ ইয়ংম্যান। ডান হাত দিয়ে মেজর জেনারেলের কাঁধ স্পর্শ করলেন প্রফেসার। নিঃশব্দে উঠে বসল সবাই।

অবাক চোখে চেয়ে রয়েছে সবাই ঘরের চার দেয়ালের চারটে একশো পাওয়ারের বালবের দিকে। না, চোখের ভুল নয়, সত্যিই কমে যাচ্ছে আলো। আঁধার হয়ে আসছে ঘরটা।

এ কী করে সম্ভব!—ভাবলেন মেজর জেনারেল। বিদ্যুতের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এতই জাদুর ক্ষমতা! এতই শক্তি পিশাচ-সাধকের! নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবেন কি করে? আলো কমে গিয়ে বিকট সব ভূতুড়ে ছায়া দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে। কমতে কমতে বালবের ভিতরের আঁকাবাঁকা তারের গায়ে লালচে আভা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকল না আর। পেন্টাকলের পাঁচ মাথায় পাঁচটা মোমবাতি শুধু জ্বলে চলেছে অম্লান।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর জেনারেল, 'এত ঠাণ্ডা আসছে কোত্থেকে!'

ঘাড়ের পিছনে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেল রানাও। শিউরে উঠল ওর শরীরটা। কাঁটা দিল গা। উত্তর থেকে আসছে হিম-শীতল বাতাসের স্রোত। বাড়ছে ক্রমে। মোমবাতির মাথায় আগুনের শিখাগুলো বাতাসের চাপে বাঁকা হয়ে গেছে

দক্ষিণে।

ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসার গোলাম জিলানী বাতাসের দিকে মুখ করে। বিড় বিড় করে কি যেন বলছেন তিনি। হঠাৎ থেমে গেল বাতাসটা, এক সেকেণ্ড, পরমুহূর্তে শুরু হলো অন্য দিক থেকে। লাফ দিয়ে সেদিকে ফিরলেন প্রফেসার, মুখে অনর্গল আউড়ে চলেছেন অদ্ভুত সব শব্দ। আবার থেমে গেল ঠাণ্ডা বাতাস, পরমুহূর্তে প্রবলতর বেগে শুরু হলো অন্য দিক থেকে। সেদিকে ফিরলেন প্রফেসার, কিন্তু ওঁর পিছন দিক থেকে বইতে শুরু করল ওটা আবার।

প্রফেসারকে খানিকক্ষণ পাগল নাচ নাচিয়ে হঠাৎ বনবন করে ঘুরতে শুরু করল বাতাসটা পেন্টাকলের চারপাশে। চাপা একটা গোঙানি শোনা যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের। ক্রমে তীব্রতর হচ্ছে। অসম্ভব ঠাণ্ডায় হাত পা জমে যাবার উপক্রম হলো রানার। প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে অশুভ বাতাস ওদের ঘিরে। মোমবাতির শিখাগুলো উন্মত্তের মত দাপাদাপি করল কিছুক্ষণ, তারপর নিভে গেল একে একে সব ক'টা।

ভড়কে গেছেন মেজর জেনারেল। কাঁপা হাতে ম্যাচ বের করলেন। কাঠি জ্বেলে ধরালেন একটা মোমবাতি, কিন্তু যেই পাশ ফিরে আরেকটা ধরাতে যাবেন, অমনি আবার একটা শীতল দমকা হাওয়া এসে এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিল মোমবাতি এবং হাতে ধরা ম্যাচের কাঠিটা।

আবার একটা কাঠি জ্বালালেন মেজর জেনারেল, কিন্তু বারুদের আগুন কাঠি পর্যন্ত পৌঁছাবার আগেই নিভে গেল। পর পর কয়েকটা কাঠি জ্বালাবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু জ্বললই না কিছুতে। প্রফেসারের দিকে চাইলেন আবছা অন্ধকারে, দেখলেন উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করছেন ওঁকে তিনি। উঠে দাঁড়াচ্ছেন নিজেও।

সামান্য যেটুকু লালচে আভা ছিল বালবের তারে, সেটুকুও নিভে গেল এবার।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে উঠে দাঁড়িয়েছে সবাই। চাপা কণ্ঠে বললেন প্রফেসার, 'হাত ধরাধরি করে দাঁড়াও সবাই। জলদি!'

চক্রের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে পেছন ফিরে গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়াল ওরা পেন্টাকলের ঠিক মাঝখানটায়। পরিষ্কার অনুভব করতে পারল রানা থরথর করে কাঁপছে সোহানা ভয়ে। মৃদু চাপ দিল ওর হাতে। ফিসফিস করে বলল, 'ভয় নেই, সোহানা!' কথাটা বলতে গিয়ে নিজের গলাটাই কেঁপে গেল ওর।

'প্রার্থনা করো, প্রার্থনা করো!' বললেন প্রফেসার উত্তেজিত কণ্ঠে। 'আল্লাকে ডাকো এখন। সবাই।'

আবার লালচে আভা দেখা দিল একশো ওয়াটের বালবের তারে। বাড়তে চাইছে আলোটা অদৃশ্য এক শক্তিকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে দুই প্রাকৃতিক শক্তি আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে। রাত্রিটা অন্ধকারের রাজত্ব, কাজেই এখন আলোর ক্ষমতা এমনিতেই সীমিত, তার ওপর পূর্ণ সহায়তা পাচ্ছে আঁধার অশুভের কাছ থেকে—খানিকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলেই চাপতে চাপতে কমিয়ে নিয়ে আসছে একেবারে সামান্যতম লালচে আভায়।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে চারজন। স্তব্ধ হয়ে দেখছে আলো-আঁধারের

যুদ্ধ। আবছা অন্ধকারটা সয়ে গেছে চোখে। মনে হচ্ছে কয়েক যুগ ধরে এইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা।

কান খাড়া হয়ে গেল রানার। কাঠের মেঝের নিচে কিসের যেন পায়ের শব্দ! মনে হচ্ছে মেঝের নিচে দিয়ে শুকনো পাতা আর ডাল মাড়িয়ে কি যেন এগিয়ে আসছে সতর্ক পায়ে। পেন্টাকলের ঠিক নিচে এসে দাঁড়াল সেটা। দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপচাপ। কী ওটা! শিরশির করে একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল রানার সর্বাঙ্গে।

ঠিক এমনি সময় টোকা পড়ল দরজায়।

'কে?' হাঁক ছাড়লেন মেজর জেনারেল।

'আমি সোহেল, স্যার। দারুণ ব্যাপার ঘটে গেছে ঢাকায়! দরজাটা খুলুন।'

পরিষ্কার সোহেলের কণ্ঠস্বর। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোহানার হাত ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিলেন মেজর জেনারেল, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন ওঁকে প্রফেসার।

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো!' বললেন প্রফেসার ফিসফিস করে।

'জলদি করুন, স্যার। ওয়্যারলেসে আপনাকে না পেয়ে এয়ারফোর্সের মিগে করে আসতে হয়েছে আমাকে। এক্ষুণি আপনার জরুরী ডিসিশন দরকার। ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গেছে ওখানে।'

নড়ে উঠলেন মেজর জেনারেল। 'সোহেলেরই গলা। নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে ঢাকায়। ছাড়ো, জিলানী, তুমি চেনো না ওকে, ও আমারই লোক।'

'বোকামি কোরো না, রাহাত!' ধমকে উঠলেন প্রফেসার। 'এটা একটা ফাঁদ!'

আবার অসহিষ্ণু টোকা পড়ল দরজায়। 'রাত কাবার হয়ে যাচ্ছে, স্যার। একটু তাড়াতাড়ি করুন।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সবাই। রানা ভাবল, অবিকল সোহেলের গলা! এই ভয়ঙ্কর রাতে ওকে বাইরে শিকদারের অশুভ প্রভাবের মধ্যে রেখে দেয়া কি উচিত হচ্ছে?

'রানা!' ডেকে উঠল সোহেল বাইরে থেকে। 'তুইও নিশ্চয়ই আছিস ঘরের ভেতর? ভয় পাচ্ছিস ঘরের ভেতর? ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি ভূত, না প্রেত? খুলে দে দরজা। কী আরম্ভ করেছিস তোরা?'

কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল চারজন। আর একটি কথাও বলল না সোহেল। পায়ের শব্দ পাওয়া গেল না ওর ফিরে যাওয়ার। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারজন। বহুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না প্রতিপক্ষের। বহু দূর থেকে কুকুরের ডাক শোনা গেল বার কয়েক, তাছাড়া নিথর, নিস্তব্ধ। আধঘন্টা পর নীরবতা ভঙ্গ করলেন প্রফেসার।

'এবার সরাসরি আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে যাও সবাই। সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবার ও আমাদের ওপর। ভয় পেতে বারণ করব না, করে লাভ নেই। কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কেউ কিছু করে বোসো না। কতখানি ভয়ঙ্কর আক্রমণ আসবে জানা নেই আমাদের, এই সামান্য হিং, রসুন, ঘোড়ার নাল আর পেন্টাকল দিয়ে রুখতে পারব কিনা ওকে তা-ও জানি না। মিথ্যে ভরসা দেব না তোমাদের।

হয়তো আমাদের এই বাধা উড়ে যাবে তুচ্ছ খড়কুটোর মত! সেক্ষেত্রে মৃত্যু…'

'আমার জন্যেই এত কিছু,' হঠাৎ বলে উঠল সোহানা। 'আমাকে বের করে দিন না এখান থেকে, যা হয় হোক আমার। আমার একার জন্যে সবার জীবন…'

চট করে সোহানার থুতনি ধরলেন পাগলা প্রফেসার। 'না মা, সালেহা। তা হয় না। আমাকে হত্যা না করে তোমাদের কারও গায়ে হাত দিতে পারবে না কেউ। ব্যস, আর কোন কথা নয়। এবার নীলের ভাইব্রেশন শুরু করো সবাই। নীল আলোর পরিমণ্ডলে ঘিরে ফেলো নিজেদের।'

নীরবে কেটে গেল দশ মিনিট। প্রতিটা সেকেণ্ড কাটছে আতঙ্কিত আশঙ্কায়। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সোহানা, 'কী ওটা!'

ঝট করে ফিরল সবাই উত্তর দিকে। এবং আঁতকে উঠল এক সঙ্গে। আবছা আঁধারে দেখা গেল কি যেন নড়ছে মেঝের ওপর। হালকা একটা বেগুনি আলো বেরোচ্ছে ওটার শরীর থেকে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাড়ছে আকারে। ক্রমে আধ মন ওজনের একটা মাংস পিণ্ডের আকার নিল জিনিসটা। মানুষ বা জন্তু নয়, ভেজা ভেজা চটচটে একদলা মাংসপিণ্ড। হৃৎপিণ্ডের মত দেখতে অনেকটা। কোথাও নাক-মুখ-চোখ-কান নেই, কিন্তু কদর্য একটা চাতুর্যের প্রভাব অনুভব করা যাচ্ছে। থকথক করে কাঁপছে ওটার শরীরের একেক অংশ বিকট ভঙ্গিতে। জ্যান্ত।

আরেকটু স্পষ্ট হলো জিনিসটা। কুষ্ঠ রোগীর মত দগদগে ঘা ওটার সর্ব শরীরে। এক আধটা দেড় ইঞ্চি লম্বা কালো পশম দেখা যাচ্ছে দু'তিন ইঞ্চি পরপর। ঘা থেকে পুঁজ গড়াচ্ছে। মেরুদণ্ডহীন কীটের মত এগিয়ে আসছে ওটা এদিকে বুকে হেঁটে। ঘাম আর পুঁজের একটা ভেজা দাগ পড়ছে মেঝের ওপর। ভয়ঙ্কর একটা বিচ্ছিরি উৎকট দুর্গন্ধে ভারি হয়ে গেছে ঘরের বাতাস। অসহ্য নোংরা গন্ধ। পেন্টাকল থেকে ঠিক দু'হাত তফাতে এসে থামল কুৎসিত জিনিসটা। তারপর হঠাৎ খলখল করে হেসে উঠল নিচু কর্কশ কণ্ঠে।

রানার গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে সোহানা। বাঁ হাতের কব্জিটা মুখের ভিতর পুরে কামড়ে ধরেছে চিৎকার ঠেকাবার জন্যে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সবাই বীভৎস জিনিসটার দিকে। চিকণ ঘাম বেরিয়ে এসেছে মেজর জেনারেলের কপালে। রানার হাত দুটো মুঠি পাকানো, নখগুলো চেপে বসেছে হাতের তালুতে।

ঠিক এমনি সময় কাঠের মেঝের নিচে প্রচণ্ড শব্দে ডেকে উঠল একটা বাঘ। ওদের পায়ের ঠিক এক ফুট নিচে। থরথর করে কেঁপে উঠল বাংলো। লাফ দিয়ে আধ হাত শূন্যে উঠে গেল ওরা নিজেরই অজান্তে। সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিল ভয়ঙ্কর মাংসপিণ্ডটা। বিকট অট্টহাসি হাসতে হাসতে ওদের মাথার ওপর দিয়ে টপকে গিয়ে থপাশ্ করে পড়ল ওটা চক্রের দক্ষিণ দিকে।

ঝট করে ফিরল সবাই ওটার দিকে। সম্মোহিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সবাই ওটার দিকে। চোখ সরাতে পারছে না। অনর্গল বিড়বিড় করে কি সব বলে চলেছেন প্রফেসার। আবার হেসে উঠল জিনিসটা। বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্যের বীভৎস কলজে-শুকানো হাসি। একেকবার একেক দিকে ভূমিকম্পের মত কেঁপে কেঁপে উঠছে ওটার থকথকে ঘা-ভর্তি শরীর। পুঁজ আর ঘাম ঝরছে মেঝের ওপর। আবার একটা

প্রকাণ্ড লাফে ঘরের পশ্চিম দিকে চলে গেল ওটা, দড়াম করে বাড়ি খেলো জানালার গায়ে, তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়েই থপাশ করে পড়ল মেঝের ওপর। ক্রুদ্ধ একটা গর্জন করে উঠল ওটা এবার, শুনলে হিম হয়ে যায় হৃৎপিণ্ড।

পাঁই করে ঘুরল সবাই ওটার দিকে। পাছে অসতর্ক মুহূর্তে লাফ দিয়ে এসে ঘাড়ের ওপর পড়ে, এই ভয়ে চোখ সরাতে পারছে না কেউ ওটার ওপর থেকে। নিচু গলায় নোংরা হাসি হাসছে ওটা এখন।

এমনি সময় দড়াম করে শব্দ হলো পিছনের দরজা খোলার। চমকে ঘাড় ফেরাল রানা। দরজা যেমন ছিল তেমনি বন্ধ, কিন্তু ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে গুলজার। হাতে সেই খড়্গ। একলাফে রানার তিন হাতের মধ্যে চলে এল গুলজার, ছোট্ট একটা গর্জন তুলে সাঁই করে চালাল খড়্গ রানার ঘাড় লক্ষ্য করে।

ঝপ করে বসে পড়ল রানা। বোঁ করে কানের পাশ দিয়ে চলে গেল খড়্গটা। গালে বাতাসের স্পর্শ পেল রানা। গুলজারের টুঁটি লক্ষ্য করে লাফ দিতে যাচ্ছিল রানা, ঠেসে ধরলেন ওকে প্রফেসার এবং মেজর জেনারেল একসঙ্গে।

'প্রে! ফর গড্স্ সেক, প্রে, মাই বয়!'

থর থর করে কাঁপছেন মেজর জেনারেল। ঘামছেন দরদর করে।

খলখল করে হেসে চলেছে কদাকার মাংসপিণ্ডটা। গুলজারকে দেখা যাচ্ছে না আর। আবছা হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে এটাও। হাসিতে তীব্র একটা বিদ্বেষ, ক্রোধ আর ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার ভাব ফুটে উঠল শেষের দিকে। মিলিয়ে গেল হাসিটা।

দশ সেকেণ্ড, পিন পতন স্তব্ধতা। তারপর কাঁপতে শুরু করল বাংলোটা। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিশাল দুটো হাত ঝাঁকাচ্ছে বাড়িটাকে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না ওরা। হাত ধরাধরি করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বসে পড়ল ওরা। থেমে গেল ঝাঁকুনি। বাতিগুলো কমতে কমতে একেবারে নিভু নিভু হয়ে এসেছে এখন। চারপাশ থেকে চেপে এসেছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ঘরের কোণে নড়ে উঠল কি যেন কালো মত। ধীরে ধীরে আকৃতি নিচ্ছে সেটা।

কেঁপে উঠল প্রফেসার জিলানীর অন্তরাত্মা। মৃত্যুদূত নয় তো! বিশাল এক ঘোড়ার পিঠে চড়ে আছে সেটা। কিন্তু এত বড় দুঃসাহস কি হবে লোকটার? এত বড় ঝুঁকি নেবে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে? একে ডেকে আনলে প্রাণ সংহার না করে ফিরবে না, সে প্রাণটা তার নিজেরও হতে পারে, একথা ভাবল না লোকটা একবারও! একটু দ্বিধা হলো না ওর শেষ অস্ত্রটা হাতছাড়া করতে!

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে চারজন। জোরে জোরে প্রার্থনা শুরু করেছেন প্রফেসার।

সাত ফুট উঁচুতে দুটো আলোর বিন্দু দেখতে পেল রানা ঘরের কোণে। লম্বাটে একটা মুখ দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে। আলো দুটো আর একটু বড় হলো। উজ্জ্বলতর হলো। কটমট করে চেয়ে রয়েছে দুটো চোখ ওর চোখের দিকে। সড়সড় করে ঘাড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে রানার চুল। প্রকাণ্ড একটা কাঁধ আর বুক দেখা যাচ্ছে এখন। বাঁকা একটা গলাও স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমে।

ঘোড়া! কুচকুচে কালো প্রকাণ্ড একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মধ্যে। লাগাম, জিন. জিনের রেকাব স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রমে। লাগাম এবং রেকাবের অবস্থান দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আরোহী রয়েছে ওটার পিঠে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কাউকে। অদৃশ্য হাত টেনে ধরে আছে বল্গা।

দরদর করে ঘামছেন প্রফেসার জিলানী। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন মেজর জেনারেল। নাক কোঁচকাল ঘোড়াটা, ঠোঁট দুটো সরে গেল দাঁতের ওপর থেকে, সাদা ফেনা দেখা যাচ্ছে দুই কশায়। অদৃশ্য আরোহীর ইঙ্গিতে কয়েক পা এগিয়ে এল প্রকাণ্ড ঘোড়াটা।

দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করল সোহানার, কিন্তু হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না। ঠকঠক কাঁপছে সর্ব শরীর। খামচে ধরে আছে সে রানার হাত। কাঠের মেঝের ওপর বার কয়েক পা ঠুকল ঘোড়াটা, নাক দিয়ে আওয়াজ করল। গরম ভেজা নিঃশ্বাস এসে লাগল সোহানার চোখে মুখে। চি-হি-হি করে ডেকে উঠে মাথা ঝাড়া দিল ঘোড়াটা, তারপর পিছিয়ে গেল কয়েক পা। মনে হলো দৌড় দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তিন সেকেণ্ড স্থির হয়ে প্রস্তুতি নিল, তারপর অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে লাফ দিল সামনের দিকে।

চিৎকার করে উঠল সোহানা। পাগলের মত টানা হেঁচড়া শুরু করল রানার হাত থেকে ছুটবার জন্যে। ইস্পাতদৃঢ় মুষ্ঠিতে ওকে ধরে রাখল রানা। রক্তশূন্য মুখে চেয়ে রইল ঘোড়াটার দিকে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি পায়ের চাপে ওদের মাথা গুঁড়িয়ে দেবে ঘোড়াটা।

ঘোড়াটাকে ঝাঁপ দিতে দেখেই ঝট করে পিস্তল বের করে গুলি করলেন মেজর জেনারেল। পাগলের মত গুলি করে চলছেন তিনি। অন্ধকার ঘরে বিদ্যুৎ চমকের মত আলোর ঝলক বেরোচ্ছে পিস্তলের মুখ দিয়ে, আওয়াজটা মনে হচ্ছে বজ্রপাত। ম্যাগাজিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামলেন না মেজর জেনারেল।

গুলি শেষ হতেই ভয়ঙ্কর একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল বন্ধ ঘরে। চারজনের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কেবল। পরিপূর্ণ অন্ধকারে ডুবে গেছে ঘরটা। পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা আর। পেন্টাকলের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বসে হাঁপাচ্ছে সবাই।

'আবার! আবার আসছে ওটা!' ককিয়ে উঠল সোহানা।

চমকে চাইল রানা ঘরের কোণে। আলোর ঝলকানিতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার আকৃতি নিচ্ছে কালো ঘোড়া। প্রথমে চোখ, তারপর মুখ, ঘাড়, পিঠ, বুক, পেট, পা। অসহিষ্ণু ভাবে মেঝেতে পা ঠুকল ওটা। মনে হলো রাশ ধরে টান দিল একটা অদৃশ্য হাত। নাক ঝাড়ল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠল ঘোড়াটা, তারপর পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সামনের পা দুটো উঁচু করল শূন্যে। মনে হলো এক্ষুণি প্রকাণ্ড খুরের আঘাতে ছাতু করে দেবে ওদের মাথা।

জ্ঞান হারিয়ে রানার গায়ের ওপর ঢলে পড়ল সোহানা।

চক্রের কিনারে এসেই হঠাৎ যেন তীব্র একটা বৈদ্যুতিক শক খেল ঘোড়াটা। ছিটকে সরে গেল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে। মাথা ঝাঁড়া দিয়ে পা ঠুকল বার কয়েক।

অদৃশ্য আরোহীর ইঙ্গিতে আবার প্রস্তুত হচ্ছে আক্রমণের জন্যে।

তীব্র আতঙ্কে নিজেদের অজান্তেই ওরা চক্রের মাঝখান থেকে সরে চলে এসেছে কিনারে। সোহানার জ্ঞানহীন দেহটা শুইয়ে দিল রানা মেঝের ওপর। ডান হাতটা বেকায়দা ভঙ্গিতে রয়েছে দেখে ওটাকে সোজা করতে গিয়েই উল্টে গেল একটা মন্ত্রপূত পানির পেয়ালা।

প্রচণ্ড হাসির শব্দে কেঁপে উঠল ঘরটা। সেই দগদগে ঘাওয়ালা কুৎসিত মাংসপিণ্ডটা এসে হাজির হয়েছে আবার। বিজয়োল্লাসে ঘর ফাটিয়ে হাসছে ওর নারকীয় নোংরা হাসি। সারা শরীর কাঁপছে হাসির দমকে। মুহূর্তে এসে হাজির হয়েছে গুলজারও। ভয়ঙ্কর নিঃশব্দ হাসি ওর বীভৎস মুখে। জ্বলছে চোখ। এক চোখে কটমট করে চেয়ে রয়েছে রানার চোখের দিকে।

বিদ্যুৎবেগে, প্রকাণ্ড কালো ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এদিকে চলে এল অদৃশ্য আরোহী। মোমবাতি আর ম্যানড্রেকের শিকড় পায়ে দলে ঢুকে পড়ল ঘোড়াটা চক্রের দুর্বল অংশ দিয়ে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চি-হিঁ-হিঁ ডাক ছেড়ে শূন্যে তুলে ফেলেছে সামনের দুই পা। বিশাল কালো পেটটা রানার মাথার ওপর। ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পেল রানা। আর এক সেকেণ্ড, তারপরেই শেষ হয়ে যাবে সব।

শেষ চেষ্টা করলেন প্রফেসার গোলাম জিলানী।

পরিষ্কার সুরেলা কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন কোরানের বিশেষ একটা আয়াত। শেষ অস্ত্র।

তীব্র একটা আলোর রশ্মি ছুটে এল পশ্চিম দিক থেকে। তীরের মত বিঁধল ঘোড়াটার বুকে। এক সেকেণ্ডের জন্যে একটা ভীত আর্তনাদ শোনা গেল। পরমুহূর্তে চুরমার হয়ে গেল ঘোড়াটা, গুঁড়ো হয়ে গেল অসংখ্য জ্বলন্ত অণু-পরমাণুতে, তারপর মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

কয়েক মিনিটের জন্যে বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিল রানা। চোখ মেলে দেখল ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ঘরের আলো। ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশে চাইল রানা। স্বপ্ন দেখছিল নাকি সে এতক্ষণ! কেউ নেই, কিচ্ছু নেই—শুধু ওরা চারজন পড়ে আছে লণ্ডভণ্ড পেন্টাকলের ভিতর একেকজন একেক ভঙ্গিতে।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসলেন প্রফেসার গোলাম জিলানী। এমনি সময় পাহাড়ের নিচের জঙ্গল থেকে এক সঙ্গে প্রাণ খুলে ডেকে উঠল ছয় সাতটা মোরগ। দপ করে পূর্ণশক্তিতে জ্বলে উঠল একশো পাওয়ারের চারটে বাল্ব। মিষ্টি হাসিতে ভরে উঠল প্রফেসারের প্রশান্ত মুখটা। হাতে বেরিয়ে এসেছে নস্যির কৌটো।

'আর কোন ভয় নেই। এটাকে একটা অবাস্তব দুঃস্বপ্ন বলে হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করো, মাহতাব। আরাম পাবে।'

মেঝের ওপর চোখ বোলাল রানা। বলল, 'তাহলে, এগুলো কি?'

মেঝের ওপর স্পষ্ট একটা ঘোড়ার ভেজা পায়ের ছাপ, একপাশে পড়ে আছে ঘোড়ার মুখ থেকে পড়া সাদা ফেনা, মাংসপিণ্ডটার ঘায়ের নোংরা পুঁজ লেগে রয়েছে জায়গায় জায়গায়। দু'টিপ নস্যি নিয়ে চারপাশে চোখ বোলালেন প্রফেসার, তারপর বললেন, 'কিচ্ছু না। ধুয়ে ফেললেই মুছে যাবে।'

'আমি উড়িয়ে দিলে শিকদারও মিথ্যে হয়ে যাবে?'

'ও মরে গেছে এতক্ষণে। আশেপাশে মরে পড়ে আছে কোথাও। আর জ্বালাতে আসবে না ও কোনদিন।'

'তাই নাকি।' ধড়মড় করে উঠে বসল সোহানা। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে। উঠে বসলেন মেজর জেনারেলও। 'সত্যি?'

'চলো না, খুঁজে দেখা যাক। নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

দরজা খুলে সবাই বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরের হাওয়াটা চমৎকার মিষ্টি লাগল রানার কাছে। ভেজা ভেজা, ঠাণ্ডা। সকাল হয়নি এখনও, পুবদিকের আকাশটা সামান্য একটু ফর্সা হয়েছে কেবল। সারা আকাশ জুড়ে এখনও জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য তারা। নির্ভয়ে সামনে এগোল ওরা।

গাড়ি বারান্দায় পাওয়া গেল লাশটা। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সিঁড়ির ওপর।

'কি করে মারা গেল?' প্রশ্ন করলেন মেজর জেনারেল। ব্যস্ত হাতে পাইপে তামাক ভরছেন তিনি।

'কোনভাবেই এঁটে উঠতে না পেরে শেষ পর্যন্ত রেগেমেগে অ্যাঞ্জেল অফ ডেথকে ডেকে এনেছিল লোকটা। এর বাড়া আর কিছুই নেই। আমরা ঠেকিয়ে দিয়েছি স্টোকেও। কিন্তু একবার ডেকে তুললে প্রাণ সংহার না করে ফিরতে পারে না ওটা। তাই ওকেই মেরে রেখে চলে গেছে।'

কাছে গিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল সোহানা, 'কোথায় শিকদার! এ তো উলফাত!'

পা দিয়ে চিৎ করল রানা উলফাতকে। ভয়ঙ্কর মুখটা আরও বীভৎস লাগছে মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে যন্ত্রণায় কুঁচকে যাওয়ায়। ঠোঁটের দুই কোণে তাজা রক্ত।

'সত্যিই তো!' বলল রানা। 'শিকদার মরেনি তাহলে!'

রানার কাঁধে হাত রাখলেন প্রফেসার। 'ডোন্ট উয়োরি, মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান। বুঝতে পারছি, পাঁড় হারামজাদা লোকের পাল্লায় পড়েছিলে তোমরা। একে হিপনোটাইজ করে এর মাধ্যমে ডেকেছিল ও ডার্ক অ্যাঞ্জেলকে। ফলে মারা পড়েছে এই বেচারা। কিন্তু তাই বলে, কি নাম যেন, ও হ্যাঁ, ওই শিকেন্দারকে ভয় পাওয়ার আর কিচ্ছু নেই। সমস্ত ক্ষমতা হারিয়েছে ও আজ রাতে।'

হাই তুললেন প্রফেসার। 'উফ! বাবারে বাবা! বড় ক্লান্তি লাগছে। একটু না ঘুমালে তো চলছে না মা, সুফিয়া!' পুবের আকাশের দিকে চাইলেন। 'দুটো ঘণ্টা ঘুমোতে পারলেও চাঙ্গা হওয়া যাবে কিছুটা।'

'নিশ্চয়ই। আমি এক্ষুণি বিছানা করে দিচ্ছি।' প্রায় ছুটে চলে গেল সোহানা।

হাসি মুখে চেয়ে রইলেন প্রফেসার ওর গমন পথের দিকে। বললেন, 'বড় ভাল মেয়ে!'

পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে মেজর জেনারেল ফিরলেন প্রফেসারের দিকে। 'ভাগ্যিস তুমি ছিলে, জিলানী! তোমার সাহায্য না পেলে...'

'ও নো নো, মাই ডিয়ার সোলজার। ও সব বললে তোমাকে মহা লজ্জার মধ্যে ফেলে দেব। তুমি কয়বার আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ সে খেয়াল

আছে? মনে আছে একবার ঝড়ের মধ্যে ডুবে গেলাম পদ্মায়, তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ে...'

'থাক, থাক, হয়েছে!' সত্যিই লজ্জায় লাল হয়ে উঠছেন মেজর জেনারেল।

'আর একবার সেই যে ঘিরে ফেলল আমাকে দশ বারোজন গুণ্ডা...'

'থামবে তুমি?'

'তুমি আর বলবে?'

'না।'

'ঠিক আছে, তাহলে আমিও থামছি।' ঘড়ি দেখলেন প্রফেসার। আর এক টিপ নস্যি নিলেন। 'চলো, সৈনিক, ঘুমু করি গে। চোখ বুজে আসছে। বয়স হয়েছে তো, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।'

'তুমি যাও, আমি আসছি এক্ষুণি। আমারও ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু রানার কাছ থেকে সবটা ব্যাপার শুনে ঢাকায় মেসেজ পাঠানো দরকার। ওরা আবার খুব চিন্তায় থাকবে। তাছাড়া ইমিডিয়েট কোন অ্যাকশন নেয়া দরকার আছে কিনা...'

'আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে, স্যার,' বলল রানা। 'সকালে রিপোর্ট দেব আপনাকে। এখন অ্যাকশন নেয়ার কিছুই নেই। ঢাকায় মেসেজ দিয়ে দিচ্ছি আমি।'

'ঠিক আছে।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন মেজর জেনারেল। 'ওই কোণার ঘরে আছে ট্র্যান্সমিটার।'

পা বাড়াল রানা। পরিশ্রান্ত দুই বৃদ্ধ টলতে টলতে এগোলেন শোবার ঘরের দিকে।

মেসেজ শেষ করে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। ফর্সা হয়ে আসছে পুবের আকাশ। জ্বলজ্বল করছে শুকতারাটা। অনেকখানি নিচে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। কুয়াশা পড়েছে। জঙ্গলের ওপারে আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র। মিষ্টি একটা হাওয়া এসে লাগছে চোখে মুখে।

নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ঢুকল সোহানা। এসে দাঁড়াল রানার পাশে।

'শুয়ে পড়েছে বুড়োরা?'

'এতক্ষণে নাকও ডাকতে শুরু করে দিয়েছে!' হাসল সোহানা। 'সারারাত মহা ধকল গেছে বেচারাদের ওপর দিয়ে।' সোজা চাইল রানার চোখে। 'তোমার বিছানাটা করে দিই?'

'তোমারটাও কোরো পাশে।' বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরল সোহানার ক্ষীণ কটি।

'যাঃ! ধরা পড়ে যাব। অ্যাই, না...প্লীজ! তার চেয়ে ছুটি নাও না কয়েকটা দিন? দুই বুড়ো চলে যাবে কাল ঢাকায়।'

'যাবার সময় তোমাকে বগলদাবা করে নিয়ে গেলে? আমি এখানে বসে বসে আঙুল চুষব?'

'আমি বলব ভয়ানক মাথা ধরেছে, পেট ব্যথা, বুক ব্যথা, দাঁতে ব্যথা। থেকে যাব।'

ওকে কাছে টেনে নিল রানা। 'তোমার এতসব ব্যথা শুনে ওরাও যদি থেকে যায়?'

কিছু একটা উত্তর এসেছিল সোহানার ঠোঁটে, কিন্তু বলতে পারল না।
নেমে এসেছে রানার নিষ্ঠুর একজোড়া ঠোঁট।
পায়ে পায়ে চলে এল ওরা খাটের পাশে। আবেশে বুজে এসেছে সোহানার চোখ। রানার গালে গাল ঘষতে ঘষতে বলল, 'প্লীজ, রানা···ছাড়ো!'
উল্টো বুঝল রানা।

—ঃশেষঃ—